জীবন যেখানে যেমন

আরিফ আজাদ

জীবন যেখানে যেমন

আরিফ আজাদ

জীবন যেখানে যেমন

আরিফ আজাদ

প্রথম প্রকাশ

একুশে বইমেলা ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

মুদ্রণ

সুরবর্ণ প্রিন্টিং এন্ড প্রেস

১৩৫/১৪৪, ডি.আই.টি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০১৪০৯-৩০৪০৫০

একমাত্র পরিবেশক

মহাকাল

৩৮, কনকর্ড এম্পোরিয়াম, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, কাটাবন, ঢাকা-১২০৫

ISBN: 978-984-95489-9-7

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 237.00 US $10.00 only.

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোনঃ ০১৪০৯-৮০০-৯০০

কোনো উৎসর্গপত্র নয়, তবু এই পৃষ্ঠায় দুটো কথা লিখতে ইচ্ছে হলো। ল্যাপটপে কিংবা ফোনে দেদারসে বাংলা লিখি, কিন্তু এই 'বাংলা' লেখাটাকে যিনি আমার জন্য জলবৎ তরলং করে দিয়েছেন তার নিপুণ সৃষ্টিশৈলীর মাধ্যমে, অভ্রের প্রতিষ্ঠাতা সেই মেহেদি হাসান ভাইকে কখনো কৃতজ্ঞতা জানানো হয়নি। এখানে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং এক-আকাশ ভালোবাসা জানিয়ে রাখলাম।

প্রকাশকের অনুভূতি

মানুষ গল্প শুনতে ভালোবাসে। গল্পের ধারাভাষ্য যেহেতু জীবনের অলিগলি থেকে উঠে আসে এবং যাপিত জীবনের মানুষগুলোই গল্পের মূল উপকরণ, সুতরাং গল্পকে ঘিরে মানুষের রয়েছে দুর্নিবার কৌতূহল।

তবে সব গল্পই যে মানুষের কথা বলে তা কিন্তু নয়। সব গল্প সত্য এবং সুন্দরের কথাও বলে না। কিছু গল্প মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়। আবার কিছু গল্প পড়ে মানুষ হতাশায় নিমজ্জিত হয়। কোনো কোনো গল্প মানুষকে বিচ্যুত করে দেয় তার স্বাভাবিক জীবনপ্রক্রিয়া থেকে। দুনিয়ায় যেমন আলোর একাধিপত্য কিংবা অন্ধকারের একক স্থায়িত্ব বিরাজ করে না, ঠিক তেমনই সব গল্প থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয় না, কোনো কোনো গল্প অন্ধকারের পথও চিনিয়ে দেয়। তবে আমরা আঁধারের যাত্রী নই। যেখানেই অন্ধকারের ঘনঘটা, আলো হাতে সেখানেই আমাদের সরব উপস্থিতি।

স্বনামধন্য লেখক আরিফ আজাদ একজন আলোর ফেরিওয়ালা। বিশ্বাসের দর্শন দিয়ে লেখালেখির জগতে পা রাখা এই লেখক এবার হাজির হয়েছেন জীবনের কিছু গল্প নিয়ে। জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গল্পগুলোকে লেখক তুলে এনেছেন তার শৈল্পিক রং-তুলিতে। আলো থেকে স্ফুরিত হওয়া সেই অসাধারণ গল্পগুলো যেমন জীবনের কথা বলে, তেমনই জীবনে রেখে যায় বিশ্বাসী মূল্যবোধের গভীর এক ছাপ।

জীবন যেখানে যেমন নিরেট গল্পের একটি বই। তবে কেবল গল্পের বই বলে একে মূল্যায়নের সুযোগ নেই। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে লেখক তার পাঠকদের জন্য রেখে গিয়েছেন চিন্তার কিছু খোরাক। পাঠকের ভাবুক মন যদি সেগুলোয় নিবিষ্ট হয়, আমরা আশা করতে পারি, গল্পের পাশাপাশি তারা জীবনের কিছু উপকারী পাঠ কুড়িয়ে নিতে সক্ষম হবে। লেখক আরিফ আজাদ তার লেখনীশক্তির মুন্সিয়ানায় গল্পগুলোকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। এ কারণে প্রতিটি গল্পই হয়ে উঠেছে সুখপাঠের এক বিশাল আধার। এ বইতে পাঠকসমাজ নতুন এক আরিফ আজাদকে আবিষ্কার করবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে বলতে হচ্ছে, লেখক নিজস্ব বানান ও ভাষারীতি অনুসরণ করে থাকেন। ফলে বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দের অচেনা রূপ দেখে তারা বিভ্রান্ত হবেন না—এই কামনা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সত্য আর সুন্দরের পথে অবিচল রাখুন। আমিন।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন

লেখকের অনুভূতি

খুব ছোটবেলা থেকেই আমি গল্প-পাগল। যেখানেই গল্পের গন্ধ পেয়েছি, সেখানেই ডুবিয়ে দিয়েছি চোখ। গল্প পড়তে, গল্প শুনতে আমার দুর্নিবার আগ্রহ। আমার মনে পড়ে শৈশবের কথা। জোছনাভরা রাতে উঠোনে মাদুর পেতে আমরা গোল হয়ে বসতাম। আমাদের মাঝে কখনো গল্প-কথক হিশেবে থাকতেন আমার দাদি, কখনো বা আমার জেঠু। মাঝেমধ্যে বাবাকেও পাওয়া যেতো। তারা পুরোনো দিনের রাজা-রানির গল্প, রাক্ষস-খোক্কসের গল্প, জ্বীন-ভূতের গল্প বলে আসরে মোহ সৃষ্টি করতেন। কোনো কোনো গল্প শুনে বিষাদে ছেয়ে যেতো আমাদের মন। আবার কোনো কোনো গল্প শুনে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যেতো ভয়ে। গল্প আমাদের মাঝে যে অনুভূতিই তৈরি করুক—গল্প শোনার ব্যাপারে আমরা ছিলাম একেবারে নাছোড়বান্দা।

সেই থেকে হয়তো—গল্প আমার জীবনের একটা অনুষঙ্গই হয়ে দাঁড়ালো। মানুষকে গল্প শোনাবার এক তীব্র আকর্ষণ, সুতীব্র বাসনা আমার মাঝেও প্রবল হয়ে ওঠে। আমার লেখা প্রথম বই *প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ* সম্ভবত সেই আগ্রহ আর বাসনার এক যৌথ সম্মিলন। সাজিদ সিরিজে আমার আলোকপাতের বিষয়গুলো অনেক বেশি কাঠখোট্টা। সেই কাঠখোট্টা বিষয়বস্তুকে গল্পাকারে উপস্থাপনের ভূতুড়ে চিন্তা নেহাত গল্প-পাগল না হলে কি সম্ভব হতো?

প্রচলিত আছে—সাহিত্য হলো সমাজের দর্পণ। একটা সমাজ কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, সেই সমাজের মানুষগুলো কী ভাবছে, কীভাবে ভাবছে, সেই সমাজের

তরুণেরা কোন পথে আছে, জোয়ানরা কীভাবে দিন পার করছে, বৃদ্ধরা কীভাবে ছিলো, সভ্যতা বিনির্মাণে সেই সমাজের অবদান কতোখানি—সাহিত্যের মাঝে এসব কিছুরই দেখা মেলে। কারণ, সাহিত্য ধারণ করে সময়কে আর সাহিত্যিকেরা সময়কে বন্দী করে যান কাগজের ফ্রেমে।

বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্য হিশেবে আমরা যা পড়ি বা পড়ে এসেছি, তাতে যদিও বা সময়ের একটা চিত্র ফুটে উঠেছে, কিন্তু নিদারুণভাবে যা অনুপস্থিত থেকে গেছে তা হলো—এদেশের শতকরা নব্বই ভাগ মানুষের জীবনাচার। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ যে ধর্মমতে বিশ্বাসী, যে ধর্মবিশ্বাস এখানে বহুযুগ ধরে শেকড় গেড়ে আছে, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়—সেই জীবনাচার, সেই বিশ্বাসের বিষয়বস্তু আমাদের বাংলা সাহিত্যসমাজে স্থান পায়নি।

সাহিত্য কল্পনানির্ভর, কিন্তু কল্পনার সূত্রপাত হয় বাস্তবতা থেকে। চারপাশের মানুষের জীবনাচার, জীবনপদ্ধতিই হলো সাহিত্যের মূল নিয়ামক। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে লক্ষ্যণীয় যে, আমাদের সাহিত্যসমাজে আমাদের চারপাশের সেই জীবনাচার, সেই জীবনপদ্ধতি অনেকাংশেই ব্রাত্য।

মানুষকে প্রেম-ভালোবাসা শেখাতে ব্যস্ত থাকা আমাদের সাহিত্যিক সমাজ কোনোদিন এই জীবনাচার, এই জীবনপদ্ধতির ভেতরে ঢুকে দু'কলম লিখবার তাড়না কেন যে অনুভব করেন না, সেটাই বড় আশ্চর্যের।

আরেকটা ব্যামোর কথা বলি—এদেশে মোটা দাগে যাদের আমরা সাহিত্যিক বলে চিনি, তাদের কাছে ইসলামি জীবনাচার সমৃদ্ধ যে সাহিত্য, সেই সাহিত্য কখনোই 'বাংলা সাহিত্য' নয়, সেটাকে তারা বলেন 'ইসলামি সাহিত্য'। কেবল ইসলামি অনুষঙ্গ, ইসলামি জীবনব্যবস্থাকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে গেলেই সেই সাহিত্যকে তারা ধরে-বেঁধে বাংলা সাহিত্যের গণ্ডি থেকে বের করে দিচ্ছেন!

অথচ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যখন স্বরস্বতী পূজোর বন্দনা করে কোনো গল্প লেখে কিংবা বুদ্ধদেব বসু যখন *মহাভারতের পথে* নামক বই লেখে অথবা মানিক বন্দোপাধ্যায়ের লেখায় যখন গভীরভাবে ফুটে ওঠে সমাজতন্ত্রের সুর—তখন কিন্তু আমরা তাদের বাংলা সাহিত্য থেকে ছুড়ে ফেলে দিই না। আমরা বলি না, ওটা 'হিন্দু সাহিত্য' কিংবা 'কমিউনিস্ট লিটারেচার', আমরা বরং তাদের আরো মহান, আরো উদার হিশেবে গণ্য করি। কেবল সাহিত্যের মধ্যে ইসলামি দর্শন ঢুকলেই

আমাদের যাবতীয় আপত্তি—ওটা বাংলা সাহিত্য নয়, ওটা ইসলামি সাহিত্য।

বাংলা সাহিত্যের দুনিয়া থেকে এই খবরদারির অবসান কবে হবে?

এই খবরদারির অবসানের একটা রাস্তা আমি চিনি—অনেক বেশি ইসলামি জীবন-দর্শন নির্ভর সাহিত্য রচনা করা এবং সেই সাহিত্যগুলোকে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে দেওয়া। সাহিত্যের মাঝে এতোদিন যেখানে অবাধ মেলামেশার কথা থাকতো, আমরা সেটাকে হালাল মেলামেশার গল্প দিয়ে ঢেকে দেবো। ইসলামি জীবনাচারের সকল অনুষঙ্গ নিয়ে আমরা গল্প লিখবো, কবিতা লিখবো, লিখবো উপন্যাস। তাহলেই, আমাদের এই ছোট ছোট পদক্ষেপগুলো একদিন বিশাল ঢেউ হয়ে সমুদ্রের কূলে আছড়ে পড়বে আর সেই ধাক্কার রেশ বিস্তৃত হবে অনেকদূর, ইন শা আল্লাহ।

বলা যায়, এমন একটা চিন্তা থেকেই *জীবন যেখানে যেমন* গল্পের বইটির সূত্রপাত। ইসলামি জীবনদর্শন নিয়েও যে গল্প লেখা যায়, ইসলামকে উপজীব্য করেও যে রচনা করা যায় সাহিত্য—এই বোধটা জাগ্রত করবার একটা ক্ষুদ্র প্রয়াসের নাম *জীবন যেখানে যেমন*।

বইতে বেশ অনেকগুলো গল্প রয়েছে। আমি চেষ্টা করেছি গল্পগুলোকে গতানুগতিকতার আবহ থেকে যথাসম্ভব দূরে রেখে এমন এক ধারা তৈরি করতে যা একজন গল্প-পাঠককে যেমন গল্পের আনন্দ দেবে, অন্যদিকে ইসলামি জীবনাচারের ব্যাপারেও শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তুলবে।

জীবনের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে গল্প লিখবার চেষ্টা করেছি। গল্পে কখনো পিতা, কখনো সন্তান, কখনো স্বামী, আবার কখনো নিরেট বন্ধু হিশেবে জীবনকে দেখাতে চেয়েছি। জীবনের নানা দিকের গল্প যেহেতু আছে, তাই গল্পগ্রন্থটির নামকরণ করেছি *জীবন যেখানে যেমন*। সাজিদ সিরিজের বাইরে এটাই আমার প্রথম একক মৌলিক গল্পগ্রন্থ।

প্রথম কাজ হিশেবে এতে ভুলত্রুটি থেকে যাবে এটাই স্বাভাবিক। সেই ভুলগুলো একান্ত আমার নিজস্ব ভেবে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবার এবং সেগুলো সংশোধন করবার সুযোগ পাবো—এটাই কাম্য। গল্পগুলো কতোখানি গল্প হয়ে উঠেছে কিংবা বইটি সাহিত্যমানে কতোখানি উত্তীর্ণ সেই আলাপ বোদ্ধা মহলের জন্য তোলা

থাকুক। মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে করজোড়ে ফরিয়াদ—তিনি যেন আমাদের ভুলগুলো ক্ষমা করে দেন এবং আমাদের কাজগুলোকে অনন্ত জীবনে নাজাতের অসিলা বানিয়ে দেন। আমিন।

আরিফ আজাদ

arifazad.bd@outlook.com

সূচিপত্র

অশ্রু ঝরার দিনে	১৩
এই প্রেম, ভালোবাসা	২২
আসমানের আয়োজন	২৭
চাওয়া না-চাওয়া	৩৭
এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যা	৪৪
জীবনের রকমফের	৫২
হিজল বনের গান	৬২
বিশ্বাস	৬৪
সুখ	৭৪
বোধ	৮৩
বাবাদের গল্প	৯৩
টু-লেট	১০০
মহীয়সী	১০৬
সফলতা সমাচার	১৩১

অশ্রু ঝরার দিনে

জোছনা প্লাবিত রাতের ধবধবে শাদা আকাশ। কোথাও যেন ডাহুক ডাকছে। বুনো ফুলের গন্ধে বাতাস আশ্চর্যরকম ভারী। চাঁদের আলোতে নদী পাড়ের বালিগুলো রুপো চূর্ণের মতো ঝিকমিক ঝিকমিক করছে। থেকে থেকে কানে আসছে কিছু পাতি শেয়ালের ডাক। এসবের বাইরে পুরো দুনিয়াজুড়ে যেন গা ছমছমে নীরবতা। কোথাও কোনো সাড়াশব্দের বালাই নেই।

জোছনার জোয়ার ভেদ করে, গ্রামীণ মেঠো পথের ধুলো উড়িয়ে, বুনো ফুলের বুনো গন্ধকে পাশ কাটিয়ে দুজন মানুষ গন্তব্যে ফিরছে। দুজন বলা কি ঠিক? ওদের সাথে তো আরও একজন আছে। চাদরে মোড়ানো বরফ-শীতল আস্ত একখানা শরীর—নড়চড়বিহীন। তাকেও কি গোনায় ধরা যায়? জীবনের সম্ভাব্য সকল পাঠ চুকিয়ে যে পাড়ি জমিয়েছে অন্য জগতে, এই জগতের বাসিন্দাদের তালিকায় তার নাম উঠানো উচিত হবে?

মাঝে মাঝে বলদগুলো চেঁচিয়ে উঠছে। গোঙানি উঠলেই তাদের পিঠে বসে যাচ্ছে শাদু মিয়ার বেতের বাড়ি। এই জোছনা মুখরিত রাতে, অরণ্যের এই সরু পথ চিনে চলতে বলদগুলোর বিশেষ অসুবিধে হবার কথা নয়। তবু পথ চলতে আজ তাদের রাজ্যের অনীহা। কে জানে, চাদরে মুড়ানো ওই যে নিথর শরীর, তার ভারে হয়তো তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে বারংবার। এ ভার বয়ে নিয়ে যাওয়া কি এতোই সোজা?

সত্যিই কি সোজা নয়? যদি নাই বা হবে, শহিদুলের কোলের ওপর ওই নিথর শরীরখানা, ওভাবে নিশ্চিন্তে পড়ে আছে কীভাবে? যে পাথুরে শরীরের ভার বইতে বলদেরা অপারগ, তার ভার কতো সহজেই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে শহিদুল। তার কোলে কেমন নিবিড় নিশ্চিন্তে পড়ে আছে ওই দেহখানা। শহিদুলেরও যেন কোনো ক্লান্তি নেই। সেও নিরাবেগ, নিশ্চল, নিশ্চুপ।

কথা শুরু করে শাদু মিয়া। এই ঘন গহিন অরণ্যের মাঝে, যেখানে বন্য জন্তুরাও বেঘোর ঘুমে অচেতন, সেখানে কতোক্ষণই বা আর চুপচাপ পথ চলা যায়? অন্তত শাদু মিয়ার মতন মুখরা মানুষের পক্ষে এতোক্ষণ মুখ বন্ধ করে রাখা সম্ভব নয়।

'তা ভাইজান, পোলাডা মরলো কেমন কইরা?'

মরে গেছে? সংবিৎ ফিরে পায় শহিদুল। সত্যিই মরে গেছে? তার ফুটফুটে আদরের সন্তান, যার মাত্র চার মাস হলো বয়স, সে কি মরে গেছে? তুলতুলে হাতখানা ধরে কতো আদরই না করতো শহিদুল! দেখতে ভারি সুন্দর হয়েছিলো ছেলেটা! সেদিন ডাক্তার বললো, 'আপনার ছেলের বয়স কতো?'

'চার মাস', অস্ফুটে জবাব দিয়েছিলো শহিদুল।

ডাক্তার যেন বিশ্বাস করলো না তার কথা। মুখ তুলে, চশমার পাতলা কাচের ভেতর দিয়ে ভালো করে আরেকবার দেখল বাচ্চাটাকে। এরপর বললো, 'বাচ্চার ডেভলপমেন্ট তো খুবই ভালো। দেখে মনে হচ্ছে এক বছর বয়স।'

অমন আদুরে চেহারা ছিলো যে, কেউ কোলে না নিয়ে থাকতে পারতো না। তুলতুলে শরীর। সবটা ছাড়িয়ে, তার মুখের হাসিটা ছিলো ভুবনভোলানো। চোখে চোখ রেখে, মুখখানা খানিক বাঁকিয়ে যখন সে হাসতো, শহিদুলের মনে হতো, জগতের সকল সরলতা, মুগ্ধতা আর বিস্ময় যেন তার চেহারায় এসে মাখামাখি করছে। তার নিটোল চাহনির দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দেওয়া যায় একটা মানবজনম। কিন্তু, একেবারে হঠাৎ করে, সেদিন প্রচণ্ড জ্বর উঠলো তার। চোখমুখ ফুলে বিপন্ন অবস্থা। ডাক্তার জানাল তার আমাশয় হয়ে গেছে। সাধারণ আমাশয় নয়, রক্ত আমাশয়। কতো যত্ন-খেয়াল, কতো আদর আর আলিঙ্গনের কাড়াকাড়ি— তার মাঝেও ছেলেটার এমন একটা রোগ হয়ে গেলো? তারপর, তারপর একদিন অকস্মাৎ, একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে শরীরে খিঁচুনি এসে কাহিল করে দিলো

তাকে। হাসপাতালে যখন নিয়ে যাওয়া হয়, ততোক্ষণে সে আর বেঁচে নেই।

বেঁচে নেই! কতো সহজেই হয়ে গেলো বলা! অথচ, শহিদুলের কাছে সে ছিলো তারা ঝলমলে এক পৃথিবী। যেদিন তার জন্ম হয়, যে ভোরবেলায়, কতো কাণ্ডই না সেদিন করেছিলো শহিদুল। তার পাগলামোতে হাসপাতালের সকলে অতিষ্ঠ হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছিলো, 'পাগল!' হ্যাঁ, পাগলই তো। কতো বছর, ঠিক কতো বছর পরে শহিদুলের ঘর আলো করে এই রত্নখানি এসেছে, তা কি এই মানুষগুলো জানে? আল্লাহর কাছে কতো করজোড় মিনতি, কতো আকুল প্রার্থনা, ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ এই ফল, তা কি কেউ বুঝবে?

হেলেদুলে এগিয়ে চলছে শাদু মিয়ার বলদ-গাড়ি। শহিদুল নিরুত্তর। শাদু মিয়া শহিদুলের মনের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করে। তার বুকের ভেতর কালবোশেখির যে তাণ্ডব বয়ে যাচ্ছে—সেটা শাদু মিয়ার অজানা নয়। সন্তান হারানোর শোকের সাথে শাদু মিয়াও সবিশেষ পরিচিত। তার ছোটো মেয়ে পারুল, সবে হাঁটতে শিখেছিল কেবল। এক দুপুরে, কোন ফাঁকে যে সে পুকুরতলায় চলে গিয়েছিল, তা আজও রহস্য। অতটুকুন মেয়ে, গুটিগুটি পায়ে অতটুকু পথ পাড়ি দিয়ে সোজা পুকুরে গিয়ে পড়বে আর সারাবাড়ির কেউ তাকে একটিবারের জন্যও দেখবে না—তা কি কম আশ্চর্যের ব্যাপার! সারাদিন খুঁজে খুঁটেও পারুলের হদিস মিললো না। পরে, সন্ধ্যের আগে আগে আস্ত পারুল ভেসে উঠলো পুকুরের মাঝে। পারুলের মৃত্যু নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা, অনেক লোক-গল্পের অবতারণা হয় মানুষের মুখে মুখে। সময় গড়িয়ে যায়, কেবল নেভে না শাদু মিয়ার বুকের দহন। ছোট্ট পারুলের সোনাবরণ চাহনিটা যেন আজও সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে শাদু মিয়ার চোখের সামনে ভাস্বর হয়ে আছে। অতএব, শাদু মিয়া বোঝে সন্তানহারা পিতৃহৃদয়ের যাতনা।

যাত্রী হিশেবে শহিদুলের সাথে আরও একজন আছে। মিনু; শহিদুলের স্ত্রী। সেও নিরুত্তর। নিষ্পলক। তার চোখের দৃষ্টি কোথায়, কোন দিগন্তে গিয়ে যে স্থির হয়ে গেলো, তা কেউ জানে না। যে জঠর ভেদ করে একদিন এসেছিল প্রাণের ফোয়ারা, সেই ফোয়ারা আজ ফুরিয়ে গেছে। নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে শূন্য দিগন্তে। মিনুর বুক ফেটে কান্না আসে, কিন্তু সে কাঁদতে পারে না। অশ্রুরাও আজ পলাতক চোখ থেকে। নিদারুণ অবসাদে ভেঙে আসে শরীর, বিপন্ন বিষাদে ক্ষতবিক্ষত সে, কাতর আর্তনাদে গুঙিয়ে ওঠে মন, তবু আজ যেন কাঁদতে মানা। আজ কি কাঁদবার দিন?

পাথরের মূর্তির মতন বসে থাকে সেও। জোছনা রাঙানো রাতের আকাশ, বুনো ফুলের মনোহর গন্ধ, মাঝে মাঝে ডাহুকের ডাক—এ সবকিছু জুড়ে মিনুর কতো মুগ্ধতা! কিন্তু, শোক আর শখের লড়াইয়ে আজ শোকটাই জয়ী। এই তারাভরা রাত, অরণ্যের অসামান্য সৌন্দর্য—কোনোকিছুতেই আজ মিনুর মুগ্ধতা নেই।

শাদু মিয়ার বলদের গাড়ি যখন জালাল মাস্টারের উঠোনে এসে পৌঁছোয়, তখন আকাশ ধবধবে ফর্সা হয়ে গেছে। ভোরের সোনারঙা রোদ এসে পাতায় পাতায় জাগিয়ে তুলেছে শিহরণ। ঘুম ভেঙেছে পাখ-পাখালির। তাদের মুখরিত কলরব চারদিকে তৈরি করেছে ব্যস্ততার আবহ। সবুজ ঘাসের মাথায় জমে থাকা শিশিরবিন্দুর ওপর রোদের ছোঁয়া এসে লাগায় সেগুলো স্বর্ণরেণুর মতন ঝলমল করে উঠলো। ভোর হয়েছে।

জালাল মাস্টারের বাড়িতে শোক যাপনের একটা আগাম প্রস্তুতি নেওয়া ছিলো, কেবল আনুষ্ঠানিক যাত্রা পর্বটাই বাকি। শহিদুলদের আগমনে যেন সমস্ত শোক আছড়ে পড়লো বাড়িটার প্রশস্ত উঠোনে। বাড়ির মহিলারা ডুকরে কেঁদে উঠলো। হায় হায় রব উঠলো আকাশে-বাতাসে। শহিদুলের মা, পাথর হয়ে বসেছিলেন উঠোনের এক কোণে। শহিদুলের কোলে চাদরে মুড়ানো নিথর শরীরটার দিকে দৃষ্টি পড়তেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনিও। বুক চাপড়ে কান্না-বিজড়িত গলায় বলতে লাগলেন, 'এ কী হলো রে ব্যাটা তোর! এ কী হলো!'

শোকের মাতমে জালাল মাস্টারের বাড়ি তখন আচ্ছন্ন। শোকে মুহ্যমান মানুষগুলোর চেহারায় ভর করেছে ঘন বিষাদের কুয়াশা। রোদের তীব্রতাও এই কুয়াশা কাটাতে পারে না। একখানা মাদুরে আলতো করে শহিদুল শুইয়ে দিলো তার কোলে থাকা নিথর শরীরটাকে। তারপর, আস্তে আস্তে অনাবৃত করলো তার চেহারা। যখন চাদরের আবরণ ভেদ করে প্রস্ফুটিত হলো সন্তানের অবয়ব, শহিদুল, আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। জমানো শোকের ভার আর সইতে পারল না সে। সন্তানের অনড় দেহটাকে বুকের সাথে জড়িয়ে নিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে তুলল সারা দেহ।

এখনো পাথর মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিনু। মাদুরে শোয়ানো সন্তানের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। চেহারায় নেমে এসেছে কালবোশেখির সমস্ত ঘন কালো মেঘ। তার অসহায় চাহনি, ব্যথাতুর চোখে সে যেন শেষ বারের মতন দেখে নিচ্ছে বুকের মানিককে।

'রাক্ষসী!' বিপুল জনতার স্রোতে একটা রব উঠেছে বটে! ও-বাড়ির আলেয়ার মা, যাকে সবাই রাঙা মা বলে ডাকে, তার মুখ থেকেই বেরিয়ে আসে এই শব্দ। মুহূর্তে জনতার সকল মনোযোগ, সকল আকর্ষণ যেন এই একটি শব্দকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে শুরু করে। এ-কান ও-কান থেকে সাত-পাঁচ-দশ কান হয়ে গেলো। সবার তীক্ষ্ণ তীর্যক দৃষ্টি এসে পড়লো উঠোনের অন্য পাশে, জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেচারি মিনুর ওপর।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো শহিদুলের মা। আলেয়ার মায়ের মুখোচ্চারিত শব্দটাকে দ্বিগুণ উৎসাহের সাথে লুফে নিয়ে, সেই শব্দটাকে পুনরায় বাতাসে গুঞ্জরিত করে দেওয়ার কাজটা খুব ভালোমতোই করতে পারলেন তিনি। আরও বহুগুণ শোকে যেন ভেঙে পড়লেন আলেয়ার মায়ের আঁচলে। কান্না আর ক্ষোভের দারুণ সংমিশ্রণে তিনি বলতে লাগলেন, 'ঠিক কইছেন, বুজান। বউ নয়, এ সাক্ষাৎ রাক্ষসী। আমার ছেলেডার জীবনটারে তামা তামা কইরে দিলো এই পোড়ামুখী। আমার ছেলে, সংসার সব তছনছ কইরা দিলো গো, বু। আমার সব শেষ। শেষমেশ আমার নাতিডারেও খাইলো এই জল্লাদী।'

অপলক তাকিয়ে আছে মিনু। কোন শোক সামাল দেবে সে? পুত্র-বিয়োগের শোকে কাতর হবে, নাকি অসহায় আর্তনাদে আর্তচিৎকার করে উঠবে তার দিকে ধেয়ে আসা অপবাদের অপমানে? মুহূর্তে এই অপবাদের সুর বাতাসের গতিতে হুড়মুড় করে ছড়িয়ে পড়লো বাড়িময়। সবার কাছে একটি ছোট্ট শিশুর মৃত্যু ঘটনার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে শহিদুলের বউয়ের রাক্ষসী হয়ে ওঠার গল্পটাই। চারিদিক থেকে ভেসে আসতে লাগলো চি-চিক্কার! মহিলারা মুখে কাপড় দিয়ে বলছে, 'রাক্ষসীই বটে!' পুরুষেরা ধি-ধিক্কার করছে শহিদুলকে। এমন অপয়া, অলক্ষুণে মেয়ের সাথে কেন সে ঘর সংসার করছে, তা-ই উপস্থিত জনতা বুঝে কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

কাহিনির নেপথ্য কারণ আরও পেছনে, আরও গভীরে। ছেলের বউ হিশেবে মিনু কখনোই শহিদুলের মায়ের পছন্দের তালিকায় থাকতে পারেনি। নেহাত শহিদুল এবং তার বাবার পছন্দের বলেই মিনু এ বাড়ির বউ হয়ে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু মিনুর কপালের লিখন যে অন্য! যে সন্ধ্যায় শহিদুল মিনুকে ঘরে তুলে আনে, ঠিক ওই রাতেই শহিদুলের বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। একেবারে হঠাৎ মৃত্যু যাকে বলে! সে রাতেও বেশ কানাকানি, বেশ কথা চালাচালি হয়েছিলো কারও কারও

মাঝে। 'আইজকার দিনেই এমনডা ঘইটলো?' বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলো আশপাশের চাচি-জেঠিরা। সভ্যতার সম্ভাব্য সকল আলো থেকে দূরে, এমন প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাঝে এমন একটা ঘটনা থেকে যে নানান ডালপালা গজাবে, তা তো জানা কথাই। জালাল মাস্টারের বাড়িতেও তা-ই হলো। তবে শহিদুলের অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসা, অপরিসীম প্রেম আর সুষম শিক্ষার কারণে সেদিন সেই গুঞ্জন খুব বেশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু ঘটনার সেখানেই সরল সমাপ্তি ছিলো না। তাদের বিয়ের এক মাসের মধ্যে একটা দুধেল গাভি হঠাৎ বিকারে ধড়ফড়াতে ধড়ফড়াতে মারা গেলো। বর্ষার ভারী বর্ষণে সেবার শহিদুলদের চাষের দু-বিঘা জমি ফসল সমেত অথৈ পানির তলায় তলিয়ে গেলো। ঘটনা যখন এই, তখন কি আর পড়শিদের বুঝতে বাকি থাকে কিছু? সন্দেহের সকল সংঘবদ্ধ তির ধেয়ে এলো মিনুর দিকেই। ও' মেয়েটাই অপয়া। ওর জন্যই এমন গেরস্ত ঘরের আজ এই দুর্গতি।

শহিদুল বাধ্য হয়ে মিনুকে শহরে তুলে আনে। মাকে কতো অনুনয়-বিনয় করেছিলো তার সাথে শহরে এসে থাকতে; কিন্তু তিনি রাজি হননি। স্বামীর রেখে যাওয়া ভিটে-মাটি ছেড়ে তিনি দূর প্রবাসে গিয়ে থাকবেন, এ তো স্বপ্নেরও অতীত। কল্পনারও বাইরে। অতএব, শহিদুল মিনুকে নিয়েই শহরে সংসার পেতেছিলো। 'মিনু অপয়া'—এমন কুসংস্কারে শহিদুল কখনোই কর্ণপাত করেনি। ধর্মীয় শিক্ষা তার যথেষ্টই আছে। মিনুরও ধর্মীয় শিক্ষার কমতি নেই। তাই গ্রামের সরল মানুষের গরল ভাবনা তাদের দূরত্বের কারণ হয়ে উঠতে পারেনি কখনোই।

শহিদুলের মা মিনুকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'দ্যাখ দ্যাখ, রাক্ষসীর দিকে তাকায়ে দ্যাখ। এক ফোঁটা জল নাই চোক্ষে। এক ফোঁটা কান্দনের আলামত নাই। শ্বশুররে খাওনের পর নিজের পোলাডারেও খাইলো ডাইনিটা। ও আল্লাহ, তুমি আমার বাপটারে বাঁচাও। এই রাক্ষসীর কবল থেইকা তুমি আমাদের মুক্তি দাও গো, মাবুদ।'

মিনু তার সেই ক্লান্ত-ভারাক্রান্ত, অসহায় চাহনি নিয়ে শহিদুলের মুখের দিকে তাকায়। আশা করে, শহিদুল হয়তো এখনই ফোঁস করে উঠবে। ভেস্তে দেবে অপবাদের সমস্ত পসরা। কিন্তু আজ! আজ শহিদুলও যেন পরাজিত। কিংবা সকলের সংঘবদ্ধ তিরস্কারের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয়। আজ পাড়া-পড়শির দিন। আজ দিনটাই শহিদুলের মায়ের। দীর্ঘ দিনের জমানো ক্লেদ, জিঘাংসা এবং রোষের সমস্তটাই যেন আজ প্রবল উৎসাহে বেরিয়ে আসতে চাইছে। জনতার যৌথ জনরোষের কাছে

আজ শহিদুল মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। অথচ তাকেই আজ খুব বেশি দরকার মিনুর। খুব বেশি প্রয়োজন।

সে' রাতে পরপর দুটো ঘটনা ঘটে গেলো। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, শহিদুল তালাক দেয় মিনুকে এবং ওই রাতেই পাশের বাড়ির তরফদারের মেয়ের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় শহিদুল। শোকসন্তপ্ত বাড়িটাতে শোকের আবহকে পাশ কাটিয়ে, প্রতিশোধের চরম জিঘাংসাই যেন প্রথম এবং প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াল। আর মিনু? শাদু মিয়ার বলদ-গাড়ি তো ছিলই। ও' রাতেই সে জালাল মাস্টারের ভিটে মাড়িয়ে পাড়ি জমায় দূরের পথে। তারাভরা রাত... সমস্ত পত্র-পল্লবে যেন জোছনার মেলা বসেছে। দূরে কোথাও ডাহুক ডাকছে। বুনো ফুলের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছে মাঝে মাঝে। থেমে থেমে শেয়ালের আওয়াজ আসছে কানে। এ সবকিছুকে ঘিরে মিনুর একরাশ মুগ্ধতা, আবার কোনো মুগ্ধতাই যেন নেই।

ঠিক এক সপ্তাহ পরে শহিদুল শহরে ফিরবে। খুব বেশি ছুটি নেই তার। নতুন বউকে এ বাড়িতেই রেখে যেতে হবে। শহিদুলের মায়ের সাথে তার গড়ে উঠেছে দারুণ সখ্য। শাশুড়ি তাকে চোখে হারায় যেন। বেরুনোর প্রস্তুতি নিতে গিয়ে শহিদুল দেখল, মিনু তার লাগেজখানা ফেলে গেছে। যা গায়ে ছিলো, ও'টুকুতেই প্রস্থান করেছে মেয়েটা। শশব্যস্ত হয়ে শহিদুল লাগেজখানা খুলে বসল। লাগজের ভেতরে ছোট্ট একখানা প্যাঁচানো চিরকুট। দ্বিগুণ উৎসাহ এবং কৌতূহলী হয়ে সেটা মুখের ওপর ধরে পড়তে লাগলো শহিদুল—

'ভাববেন না আবেগ দিয়ে আপনার কাছে নিজের ভুলের ফিরিস্তি লিখতে বসেছি। আপনার কাছে জবাবদিহির আর কোনো অধিকার কিংবা দরকার, কোনোটাই আর অবশিষ্ট নেই। কারণ, এই চিঠি যখন লিখছি, তখন আপনার সাথে আমার জাগতিক সকল সম্পর্কই ছিন্ন হয়ে গেছে। তবু, নিজের অবস্থানটা বলে যেতে না পারলে শান্তি পাচ্ছিলাম না। একটা অপবাদ মাথায় নিয়ে এভাবে প্রস্থান করবো, তা কোনোভাবেই মানতে পারছিলাম বলেই এই লেখাটুকুর অবতারণা।

ছেলেটা আমার ছিলো। আপনারও। দুজনের। তাকে তো আমিই দীর্ঘ নয় মাস পেটে ধারণ করেছি। আমার রক্ত-মাংস চুষে সে বেড়ে উঠেছিল। আস্তে আস্তে। সে যখন অস্তিত্বে এলো, যেদিন তার আগমনের সংবাদ আমরা পেলাম, মনে পড়ে কতো বিচিত্র উল্লাসে, কতো সুখ আর স্বপ্নের মাঝে আমরা ডুব দিয়েছিলাম? আমার

নাড়ি ছিঁড়ে যখন সে বেরোয়, জানেন, একটিবারের জন্য আমার মনে হয়েছিলো, বোধকরি আমি আর বাঁচব না। তখন আমার মায়ের কথা খুব মনে পড়ছিল। মায়ের মুখটা না দেখেই যদি মরে যাই, কেমন যেন একটা অতৃপ্তি রয়ে যাবে মনে। কিন্তু, পরক্ষণে যখন আমাদের সন্তানের কথা মনে এলো, যখন মনে হলো যে আমার শরীরে বেড়ে উঠছে অন্য আরেক আমি, সে বেঁচে থাকলেই আমার বেঁচে থাকা হবে, তখন মনে হলো—না! এমন মৃত্যুতে ভয় কীসের? এ যে বীরাঙ্গনার মৃত্যু!

যখন বাবুটা এলো পৃথিবীতে, আমাদের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে? তাকে ঘিরে কতো যত্ন, কতো খেয়াল আমাদের। গভীর রাতে যখন সে কান্না করে উঠতো, আমি মুহূর্তে জেগে যেতাম। তাকে শান্ত করতে আমার সে কী কসরত! কখনো আপনাকে ডেকে তুলিনি। জাগাইনি। বিরক্ত করিনি। আমিই সামলেছি। যখন তার আমাশয় ধরা পড়ে, একেবারে কাহিল হয়ে ওঠে সে, সেই স্মৃতিগুলো আমি কখনোই ভুলবো না।

আপনি, আপনার মা এবং আপনার আশপাশে সবার অভিযোগ, সন্তানের মৃত্যুতে কেন আমার চোখে একফোঁটা পানি নেই। প্রশ্নটা নিজের প্রতি আমারও। পরে মনে হলো, ওর জন্য যা কাঁদার, তা তো আমি জায়নামাযেই কেঁদেছি। আর কোনো জল যে আমার চক্ষু-কোটরে অবশিষ্ট নেই। কোত্থেকে আসবে?

আমি কাঁদিনি। বিলাপ করিনি। বুক চাপড়াইনি। কেবল পাথর হয়ে ছিলাম। আমার এরূপ কাণ্ডকারখানা দেখে আপনাদের মনে অনেক প্রশ্ন দানা বেঁধেছে, অনেক কৌতূহল জেগে উঠেছে, অনেক সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে। আপনাদের প্রশ্নোন্মুখ চেহারা, কৌতূহলোদ্দীপক অভিমূর্তি আমাকে কাঁদাতে পারেনি। কেন জানেন? অনেকদিন আগে আমি একটি হাদিস জেনেছিলাম। সম্ভবত এমন দিনের জন্যই ওটা আমার চোখে পড়েছিলো এবং আমি ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে সেটা পড়েছিলাম সেদিন। হাদিসটি শুনুন—

যখন আল্লাহর কোনো বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরেশতাদের বলেন, 'তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ করে ফেললে?'

ফেরেশতারা বলে, 'জি।'

তখন আল্লাহ আবার বলেন, 'তোমরা আমার বান্দার প্রাণ-কণাটাকে ছিনিয়ে আনলে?'

ফেরেশতারা আবার বলে, 'জি।'

আল্লাহ বলেন, 'তখন আমার বান্দা কেমন আচরণ করেছে?'

ফেরেশতারা বলে, 'আপনার বান্দা ধৈর্য ধরেছে আর বলেছে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছি এবং তার কাছেই পুনরায় ফিরে যাবো।'

ফেরেশতাদের কাছ থেকে বান্দার ধৈর্যের এমন চমৎকার বর্ণনা শুনে মহামহিম আল্লাহ তখন বলেন, 'আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করো, এবং সেই বাড়ির নাম দাও—*প্রশংসিত বাড়ি*।'

আমি বিশ্বাস করি, আমার সন্তান আমাকে ছেড়ে কোথাও যায়নি। তার সাথে আমার সাময়িক একটা বিচ্ছেদ ঘটেছে বটে, কিন্তু জান্নাতে, সেই প্রশংসিত বাড়ির উঠোনে, সবুজ দূর্বাঘাসের ওপর শিশির আচ্ছাদিত পথে আমি তার হাত ধরে হাঁটবো, ইন শা আল্লাহ। আমার মানিকের সাথে এমন সুন্দর মুহূর্ত কাটাতে হলে, জগৎ আমাকে যতই রাক্ষসী, অপয়া, অলুক্ষুণে বলুক, তাতে কি আমার বিচলিত হওয়া চলে?

ভালো থাকুন আপনি। আপনার আগামীর দিনগুলো সুন্দর হোক। আপনার জন্য আমার অফুরন্ত দুআ।'

রাত নেমে এসেছে। বাইরে ঝিঁঝিপোকার অবিশ্রান্ত চিৎকার। তারও দূরে, কোথাও থেকে যেন বুনো শেয়ালের আর্তচিৎকার ভেসে আসছে বাতাসে। আর, প্রকৃতির কোথাও যেন এক গভীর গোঙানি। কোথা থেকে ধেয়ে আসছে এই গোঙানির সুর? শহিদুলের বুকের গহিন থেকে?

এই প্রেম, ভালোবাসা

[এক]

দুপুর থেকে বাইরে কয়লা-পোড়া রোদ। রোদের তেজ আর তাপে ঘরের ভেতরটাও উনুনের মতো গরম হয়ে আছে। মাথার ওপর অবিরাম, অবিশ্রান্তভাবে ঘুরতে থাকা সিলিং ফ্যানের হাওয়াগুলোও যেন বিদ্রোহ করে বসেছে। গায়ে হাওয়া লাগছে না আগ্নেয়গিরির তাপ লাগছে বোঝা মুশকিল।

এরই মাঝে রান্নাঘর থেকে খুন্তি হাতে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো রেবেকা। এসেই আমাকে বললো, 'শুনছো, মাছের তরকারিতে না লবণ একটু বেশি হয়ে গেছে। পানি দিলেই কমে যেতো, কিন্তু তুমি তো অতো ঝোল পছন্দ করো না, তাই দিতে চাচ্ছি না। কোনো সমস্যা হবে তোমার?'

আমি দেখলাম, কথাগুলো বলার সময় রেবেকার কপাল বেয়ে ঝরনাধারার মতো ঘাম ঝরছে। সে অভিজ্ঞ অভিনেত্রীর মতো, ওড়নার একটা অংশ দিয়ে চট করে তা মুছে নিয়ে আমার উত্তরের অপেক্ষায় দরজার কিনারে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি হাঁসফাঁস করতে করতে বললাম, 'দরকার কী বলো তো এতো কষ্ট করার? সাধারণ কিছু একটা হলেই বেশ চলে যেতো। এই গরমের মাঝে চুলোর পাড়ে বসে হরেক পদের তরকারি রান্না করার কোনো মানে আছে?'

আমার এই কথাকে খুব একটা আমলে নিলো না রেবেকা। নিজের ওড়না দিয়ে

দ্বিতীয়বার কপাল বেয়ে নামা ঘাম মুছতে মুছতে বললো, 'সপ্তাহে এই একটা দিনই তো দুপুরে বাসায় খেতে পারো। অন্যসব দিন তো সেই বাইরেই ছুটোছুটি। কী যে খাও আল্লাহ মালুম! এই একদিনই যদি তোমাকে ভালো-মন্দ কিছু রেঁধে খাওয়াতে না পারি, তাহলে আর আমার স্ত্রী হওয়ার সার্থকতা কোথায়?'

'বেশ প্যাঁচাল পাড়া শিখে গেছেন আপনি! এই যে লম্বা লম্বা লেকচার শোনাচ্ছেন, নিজের চেহারাটার দিকে একবার তাকিয়েছেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে?'

'ও আমার দেখে আর কী হবে, বলো? নতুন করে তো আর বিয়ে হবে না আমার! তোমার যদি আমাকে আর পছন্দ না হয় বলবে, আমি সোজা বাপের বাড়ি চলে যাবো।'

'হয়েছে বাবা হয়েছে! কান ধরছি! যার জন্যে চুরি করি সে-ই বলে চোর! বলতে গেলাম ভালো, হয়ে গেলাম খারাপ!'

'আমার অতো ভালো চাওয়া লাগবে না তোমার। এখন বলো তাড়াতাড়ি, খানিকটা লবণ বেশি হলে ঝামেলা হবে?'

'ঝামেলা মিটে যেতো যদি তুমি ওই গরম চুল্লি থেকে বেরোতে। বাইরে খেতে খেতে লবণ কম আর বেশি—দুটোই আমার মুখ-সওয়া হয়ে গেছে।'

রেবেকা আর কোনো জবাব দিলো না। এক ভোঁ-দৌড়ে রান্নাঘরে চলে গেলো।

রেবেকা আসলে সত্যিই বলেছে। কাজের সুবাদে আমাকে ছুটে বেড়াতে হয় দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া। আমার কাজ হলো ফিচার লেখার উপাদান সংগ্রহ, এবং তা দিয়ে পত্রিকার জন্য ফিচার তৈরি করা। সাঁওতাল পল্লি থেকে শাপলার বন—কোথায় যাই না আমি গল্পের উপকরণ খুঁজতে? নিরন্তর ছুটতে গিয়ে দিন যে কখন রাত হয়ে যায়, রাত কেটে ভোর আসে—টেরই পাই না।

[দুই]

'যেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেঁতুল'—প্রবাদ বাক্যকে সত্যি প্রমাণ করে, কটমটে সূর্যটাকে একদল দস্যি মেঘ এসে ঢেকে ফেলল। মুহূর্তকাল পরেই নেমে এলো অঝোর ধারার বৃষ্টি। অবিরাম ধারার বর্ষণ প্রকৃতিজুড়ে। বৃষ্টির এমন একাধিপত্য

দেখে কে বুঝবে—একটু আগেও এখানে কাঠফাটা রোদ ছিলো? আকাশের বর্ষণে সবকিছু যেন এক অনুপম স্নিগ্ধতা আর শীতলতায় ভরে গেলো।

আমি দেখলাম, আমার জানালার কিনারে দুটো চড়ুই গা ঝাড়া দিয়ে বসেছে। হঠাৎ এমন ঝড়ো বৃষ্টিতে তারা সম্ভবত বিভ্রান্ত। এমন গা-শীতল করা আবহাওয়ায় নিজেকে চাঙা করে নিতে বেলকনিতে এসে দাঁড়ালাম। আকাশ থেকে প্রকাণ্ড আকারের বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়ছে। প্রচণ্ড গরমে হাহাকার করে ওঠা প্রকৃতিতে এই বৃষ্টি-জল একফালি স্বস্তি হয়ে ধরা দিলো।

বৃষ্টি আমার বরাবরই পছন্দের। এই একটা জিনিসকে নিয়েই সম্ভবত পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সাহিত্য রচিত হয়েছে। আর, সেই সাহিত্যের তিনভাগের দুইভাগ হয়েছে কেবল ভারতীয় উপমহাদেশে। বৃষ্টি নিয়েও যে এতো চমৎকার সাহিত্য রচনা করা যায়—এই কথা অনেক ইউরোপীয়রা বিশ্বাস করতো না। তাদের কাছে বৃষ্টি ছিলো নিছক বিরক্তি আর বিড়ম্বনার কারণ। অবশ্য, উত্তর-আধুনিক ইউরোপ যখন দালান আর ইমারতে ভরে গেলো, প্রকৃতির সান্নিধ্য থেকে একপ্রকার দূরেই ছিটকে পড়লো ইউরোপিয়ানরা। বৃষ্টির সময় প্রকৃতি যে মনোহরা রূপ ধারণ করে—তা অবলোকনের সুযোগ আর থাকলই বা কই তাদের? এ জন্যে বোধকরি তারা ভাবতে পারতো না যে—বৃষ্টি নিয়েও চমৎকার সাহিত্য তৈরি করা যায় এবং দুর্দান্ত সাহিত্য তৈরি হয়েও আছে।

বৃষ্টি নিয়ে আমার এমন ভাবালুতার মাঝে ছেদ ঘটালো রেবেকা। সে বেলকনিতে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললো, 'কী সুন্দর বৃষ্টি, তাই না গো?'

'হু।'

'মানুষের দুআ যে এতো দ্রুত কবুল হয়, তা দেখে আমি তাজ্জব বনে গেলাম, জানো?'

আমি কৌতূহলী দৃষ্টিতে রেবেকার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'বুঝিনি।'

'ওই যে, গরমে তুমি বেশ হাঁসফাঁস করছিলে না? তখন রান্নাঘর থেকে মনে মনে দুআ করছিলাম। বলছিলাম, আল্লাহ, একটা ঝুম বৃষ্টি দিয়ে চারপাশটা ঠান্ডা করে দাও। আমার জামাইটার অস্বস্তি লাগছে অনেক। এমন বৃষ্টি দাও যেন আমার জামাই বৃষ্টি নিয়ে একটা গল্পও লিখে ফেলতে পারে। হি হি হি।'

'তুমি কি সত্যিই এমন দুআ করেছিলে?'

'হ্যাঁ। এমনটাই তো জপছিলাম রান্নাঘরে। কিন্তু বিশ্বাস করো, সত্যি সত্যিই যে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে—তা আমার ধারণাতেই ছিলো না। আল্লাহ মাঝে মাঝে কতো দ্রুত দুআ কবুল করে ফেলেন, দেখলে?'

আমি জানি রেবেকা মিথ্যে বলেনি। ও কখনোই মিথ্যে বলে না। আমাদের পাঁচ বছরের দাম্পত্য জীবনে কোনোদিন একটিবারের জন্যও তাকে আমি মিথ্যে বলতে দেখিনি। ও যখন এই দুআ করেছে বললো, তাহলে সেটা অবশ্যই সত্যি।

ফ্যানের নিচে বসে হাওয়া গিলতে থাকা আমার অস্বস্তি কাটাতে বৃষ্টির জন্য দুআ করেছে জ্বলন্ত চুলোর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক রমণী! কী অবিশ্বাস্য ভালোবাসা! কী অনুপম মায়ার বন্ধন!

রেবেকা আবার বললো, 'বৃষ্টির সময় দুআ করলে ওই দুআও কবুল হয়। চলো, আমরা দুআ করি।'

'কী দুআ করবো?'

'যা মন চায় করো।'

জানালা গলে, রেবেকার হাত চলে গেলো বাইরে। রিমঝিম বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে তার হাত। আমি দেখলাম, সে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কিছু বলছে। আমি জানি, তার এই বলার অনেকটা জুড়ে আমি আছি। ও আমাকে রাখবেই।

[তিন]

রাত নেমে গেছে অনেক আগেই। থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে এখন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমি ল্যাপটপ খুলে বসে পড়লাম। কালকেই আমাকে একটা ফিচার জমা দিতে হবে অফিসে। পত্রিকার ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন প্রকাশের সময় আর বেশি নেই হাতে।

অনেকটুকু লেখার পরে খেয়াল করলাম, বাইরে আবার ঝুম বৃষ্টি নেমেছে। বাতাসে জানালার কাচগুলো রিনিঝিনি শব্দ তুলছে। আমি পড়ার ঘর থেকে শোবার ঘরে এলাম। আলো জ্বালিয়ে দেখি রেবেকা ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিনের সাংসারিক

ব্যস্ততার পরে এক শান্তির ঘুমে বেঘোর সে। তার নিষ্পাপ, মায়াময় চেহারা, তাতে কোথাও কোনো অভিযোগের রেখা ফুটে নেই। এই মেয়েটা সারাটা দিন আমাকে নিয়ে ভাবে। আমার ভালো থাকা, আমার ভালো-লাগা নিয়ে তার কতো ভাবনা-চিন্তা! মাঝে মাঝে মনে হয়—মেয়েরা বোধকরি অন্য ধাতুতে গড়া। একেবারে অপরিচিত একটা মানুষ, একটা পরিবার, একটা পরিবেশকে তারা কতো নিবিড়ভাবে আপন করে নেয়! কতো সুন্দর করে তাতে এঁকে দেয় ভালোবাসার আল্পনা!

বেলকনিতে এসে দাঁড়ালাম আমি। বৃষ্টির সময়ে দুআ করলে সেই দুআ কবুল হয়। বাইরে হাত বাড়াতেই বৃষ্টির ফোঁটাগুলো আমার হাতে লেগে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। চোখ বুজে, হৃদয়ের গভীর থেকে ভাষা টেনে নিয়ে, বিড়বিড় করে বললাম, 'পরওয়ারদিগার, রেবেকাকে আমি অসম্ভব ভালোবাসি। এই দুনিয়ার মতো, জান্নাতেও আমরা এভাবে কাছাকাছি, পাশাপাশি থাকতে চাই।'

আসমানের আয়োজন

[এক]

ছমিরুদ্দিন ভাই আমার প্রতিবেশী। পেশায় টুপি-বিক্রেতা। নিজের হাতে টুপি বানিয়ে বিক্রি করেন। পেশাটা মূলত পৈত্রিক সূত্রেই পাওয়া। উনার বাবা জমিরুদ্দিন সরদার হাতে-কলমে ছেলেকে এই বিদ্যে শিখিয়ে গেছেন। দিব্যি যে ব্যবসা করছেন, তা অবশ্য নয়। কোনোরকমে দিনগুজার যাকে বলে। ছমিরুদ্দিনের তাতে কোনো আফসোস নেই যদিও; তবু তার মুখে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, 'বাপে আমাগো লাইগা এক্কান মসজিদ ছাড়া আর কিচ্ছু রাইখ্যা যায় নাই।'

কথাটা মিথ্যে নয়। মানুষ সন্তানাদির জন্যে ব্যাংক-ব্যালেন্স, জায়গা-জমিসহ নানা স্থাবর-অস্থাবর সহায়-সম্পত্তি করে গেলেও জমিরুদ্দিন চাচা রেখে গেছেন কেবল একটি মাটির মসজিদ। সারাজীবন নিজের হাতে যা কামাই করেছেন, তার মধ্যে যেটুকু সঞ্চয়াদি ছিলো, তা দিয়েই বাড়ির নিকটে জমি কিনে তাতে নিজ হাতে মাটির একটি মসজিদ তুলেছেন। জমিরুদ্দিন চাচার স্বপ্নই ছিলো এটা।

আমরা তখনো অনেক ছোটো। দেখতাম চাচা সারাদিন হেঁটে হেঁটে টুপি বেচতেন। সাথে থাকতো ছমিরুদ্দিন। আমাদের দেখলেই চাচা হাঁক ছেড়ে বলতেন, 'ও বাজানেরা, আমি মসজিদ বানাইতেছি এক্কান। তোমরা নামায পইড়তে আইসো কিন্তু। আইলেই তোমাগো আমি লজেন্স দিমু।'

লজেন্সের লোভে আমরা চাচার মসজিদটা দেখতে যেতে চাইতাম। কিন্তু বাবা বাগড়া দিতো। বলতো, 'জমির পাগলার কথা হুইনো না। খাইতে ভাত পায় না আবার হেতে বানাইব মসজিদ! ব্যাঙের হইছে গিয়া সর্দি-জ্বর! লজেন্সের লোভ দেখাইয়া তোমাগোরে নিয়্যা হাটে বেইচ্যা দিব কইলাম।'

ছেলে ধরে নিয়ে বেচে দেওয়ার একটা রটনা তখনো গ্রামাঞ্চলে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিলো। হঠাৎ হঠাৎ শোনা যেতো অমুক বাড়ির অমুকের ছেলেকে ভরদুপুরে ছেলেধরা নিয়ে গেছে। সারা তল্লাটে হইচই পড়ে যেতো। বাবা-মায়েরা আমাদের ওপর বাড়িয়ে দিতো বাড়তি নজরদারি। দুপুরের ঘুম তুলে রেখে মাঠ দাপিয়ে বেড়ানোর আমাদের যে আদিম উৎসব, সেই উৎসব চুলোয় যায় এই ছেলেধরা গুজবের তোপে। কি সকাল, কি দুপুর বা বিকেল—বাচ্চাকাচ্চারা বাইরে বেরোতেই যেন ভুলে গেলো। চাপা একটা ভয়ে শীতল হয়ে থাকে সারা গ্রাম। বাইরে বেরোলেই বিপদ। ওত পেতে আছে ছেলেধরার দল। কিন্তু সেই ছেলেধরার দলকে কেউ কোনোদিন চোখের দেখা আর দেখল না। কেবল মানুষের মুখে মুখেই ছড়িয়ে পড়েছিলো তাদের খ্যাতির বাহার।

'জমিরুদ্দিন চাচা লজেন্সের লোভ দেখিয়ে আমাদের হাটে বেচে দেবে'—বাবার এই কথা আমার বিশ্বাস হলো না। যে লোক টুপি বেচে, যে লোকের মাথায় টুপি, মুখে লম্বা দাড়ি, সে লোক মিথ্যে কথা বলতে পারে? সে লোক ছেলেধরা হতে পারে?

এক দুপুরে, বাড়ির সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম জমিরুদ্দিন চাচার বানানো মসজিদ দেখতে। আমাদের পাশাপাশি বাড়ি হলেও মাঝখানে রয়েছে একটা মৃতপ্রায় নদী। এককালের ভরা-যৌবনা নদীটা এখন তার ভগ্নাবশেষ নিয়ে কোনোমতে এখানে টিকে আছে। যদিও মৃতপ্রায় নদী, স্রোতের বালাই নেই কোনো, তবু একসিনা পানি তাতে বর্তমান থাকে সর্বদাই। সেই পানির গা জুড়ে বসতি গড়ে থাকে অসংখ্য কচুরিপানা। এই একসিনা পানি ডিঙিয়ে, কচুরিপানার আস্তরণ সরাতে সরাতে জমির চাচার মসজিদ দেখতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। আমি অন্যপথ ধরলাম। আধ ক্রোশ পথ ঘুরে ঠিক ঠিক পৌঁছে গেলাম জমিরুদ্দিন চাচার বাড়িতে।

বড় একটা জারুল গাছের নিচে বৃদ্ধ মানুষের শরীরের মতন জবুথবু হয়ে থাকা একটা ঘর। ঘরের দেয়াল গলে বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইছে যেন। সামনের খুঁটিগুলো জমিরুদ্দিন চাচার জীবনের প্রতিচ্ছবির মতোই; দুঃখের ভারে নুইয়ে পড়েছে। ভীষণ

বর্ষার বিপন্ন সময়ে এই ঘর কতোখানি বিপজ্জনক তা দেখামাত্রই আঁচ করতে পারা যায়। তবুও, জীবন কি থেমে থাকে? শ্বাপদসংকুল অরণ্যের মাঝ থেকে মধু সংগ্রহ করতে যাওয়া মৌয়ালেরা ভালো করেই জানে ঘন জঙ্গলের কোথাও শিকারের লোভে হাঁ করে আছে কোনো ক্ষুধার্ত বাঘ, কিংবা কোনো তরুলতার গায়ে লেপ্টে আছে বিষধর কোনো সাপ। উভয়ের মারণাঘাতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও তারা গহিন অরণ্যে পা বাড়ায়। কারণ, জীবনে বাঁচবার যন্ত্রণা মৃত্যুযন্ত্রণার চাইতেও মাঝে মাঝে প্রবল হয়ে ওঠে।

জমিরুদ্দিন চাচার জীর্ণ এই গৃহখানা দেখলে এমনই বিপদের সংকেত পাওয়া যায়। যেকোনো মুহূর্তে, যেকোনো ঝড়ে একটা ধ্বংসস্তূপের আগাম চিত্র যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অথচ এই ঘরেই চাচা জমিরুদ্দিন বাস করে যাচ্ছেন বছরের পর বছর। এখানেই তিনি টুপি বানান। এখানেই সংসার এবং হয়তো এখানেই তার জীবনের পরিসমাপ্তি।

মাথার ওপর থেকে দুপুরের সূর্য সরে হালকা পশ্চিমে চলে গেছে। এখন বিকেল। আমি দেখলাম, ছমিরুদ্দিনকে সাথে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন জমিরুদ্দিন চাচা। একজনের হাতে কোদাল আর অন্যজনের হাতে বড় একটা পাতিল। আমাকে দেখে চিনে ফেলল ছমিরুদ্দিন। বয়স তখন কতো আর হবে? তেরো বা চৌদ্দ। ছমিরুদ্দিন আমাকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলো। আমি কাছে এলে জমিরুদ্দিন চাচা বললেন, 'কাশেমের বাপের পোলা না তুমি?'

আমি স্মিত হেসে বললাম, 'জে, চাচা।'

'মসজিদ দেখবার আইছো?'

'হ।'

'মা শা আল্লাহ! মা শা আল্লাহ। ছমির, পকেটে লজেন্স আছেনি?'

'নাই বাপজান!', ছমির উত্তরে বললো।

'ঘরেত্তুন দুইডা লজেন্স নিয়া আয়। তাত্তাড়ি যা। পুলাডারে দুইডা লজেন্সই দে।'

ছমির পাতিল মাটিতে রেখে লজেন্স আনতে যায়। ঘরের কপাট খুলতে গেলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হলো। চোখের পলকেই ছমির লজেন্স নিয়ে ফিরে আসে। আমার হাতে

লজেন্স দু-খানা পুরে দিয়ে সে বললো, 'দুইডাই তোর।'

সত্যি কথা হলো, লজেন্সের লোভে আমি জমির চাচার আস্তানায় হানা দিইনি। আমি এখানে এসেছি কেবল মসজিদটা দেখার জন্য। সেই মসজিদ, যার গল্প জমির চাচা সারা গ্রামময় করে বেড়ায়। তার স্বপ্ন। তার জীবনাকাঙ্ক্ষা। একদিন সেই মসজিদে একটা মিনার হবে। সেই মিনার হতে আযানের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র।

দুই জনের কাফেলায় আমি তৃতীয় জন হিশেবে যুক্ত হয়ে গেলাম। খুব বেশি নয়, জমিরুদ্দিন চাচার বসত-ভিটা থেকে অল্প উত্তর-দক্ষিণে গেলেই একটা উঁচু ঢিপি এলাকা। বৃষ্টি-বাদলে পানি ওঠার সম্ভাবনা নেই। এই উঁচু উর্বর জমিতে চাষ হচ্ছে একটা নতুন স্বপ্নের। জমিরুদ্দিন চাচার স্বপ্ন। স্বপ্নের নাম মসজিদ।

মসজিদের জন্য জমিরুদ্দিন চাচা যার কাছ থেকে জমি কিনেছেন তার নাম নয়ন ব্যাপারী। আমরা হাঁটতে হাঁটতে সেই উঁচু ঢিপি এলাকায় এসে দেখি গলায় গামছা ঝুলিয়ে নয়ন ব্যাপারী বসে আছে। তার ঠোঁট দুটো রক্তজবা ফুলের মতন লাল। আমাদের দেখে সে মুখ থেকে পানের পিক ফেলে জোর গলায় বললো, 'আইছো জমিরুদ্দিন?'

'হ মিয়া ভাই।'

'তোমার মসজিদ কদ্দূর?'

'এই তো, হইয়া যাইব।'

'কই, কিছুই তো চোখে দেহিনা।'

জমিরুদ্দিন চাচা হাসে। হেসে বলে, 'সময় হইলেই দেখা যাইব মিয়া ভাই।' কথাগুলো বলে জমির চাচা ছমিরুদ্দিন আর আমাকে নিয়ে একটু তফাতে চলে এলেন। বুঝতে পারলাম এটাই সেই মসজিদের জায়গা। জমিরুদ্দিন চাচা খানিকক্ষণ একদৃষ্টে জায়গাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অপলক। এরপর ছমিরুদ্দিনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কাজে লাইগা পড় বাজান।'

কাজে লেগে গেলো বাপ-বেটা দুজনেই। জমিরুদ্দিন চাচা কোদাল দিয়ে মাটি সমান করে, আর উদ্বৃত্ত মাটি পাতিলে ভরে দূরে ফেলে আসে ছমিরুদ্দিন। কখনো ছমিরুদ্দিন খোঁড়ে, চাচা মাথায় বয়ে নিয়ে যায় মাটি। খানিক বাদে আবার দেখা মিললো নয়ন

ব্যাপারীর। কাঁধে সেই গামছা ঝোলানো। ব্যাপারীদের বৈশিষ্ট্যই বোধকরি এ রকম। নয়ন ব্যাপারী বললো, 'আমি কই কি জমিরুদ্দিন, মসজিদ বানাইবার চিন্তাটা তুমি বাদ দেও।'

নয়ন ব্যাপারীর কথায় কোনো উত্তর করে না জমিরুদ্দিন চাচা। একমনে নিজের কাজ করে যাচ্ছে। নয়ন ব্যাপারী আবার বললো, 'মসজিদ বানাইবো মহল্লার মাইনষে মিইল্লা। তুমি একাই মসজিদ বানাইবা কিল্লাই? এতে তোমার ফায়দা কী জমিরুদ্দিন? তার চাইতে তুমি এক্কান কাজ করো। জমিখানায় আবাদ করো। ফসল লাগাও। সবজি লাগাও। ফসলাদি বেইচা তোমার আরামেই দিন কাটবো। টুপি বেইচা আর কয় টেকাই কামাও, কও তো?'

মাথা তুলে নয়ন ব্যাপারীর দিকে তাকান জমিরুদ্দিন চাচা। তার চাহনিতে স্বপ্নে ভর করে চলার এক অদম্য স্পৃহা। স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দেওয়ার প্রস্তাব সেই স্পৃহায় যেন আগুন ধরিয়ে দিলো। সেই আগুনের সবটুকু পারলে জমিরুদ্দিন চাচার চোখ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু আসে না। চাচা ধৈর্য ধরে আর বলে, 'ভালা কথাই কইছেন মিয়া ভাই। তয়, মসজিদ বানানের চাইতে বড় আরামের কাজ আর কী আছে কও? এইডাই তো লাভের ব্যবসা।'

নয়ন ব্যাপারীর কথা হালে পানি পেলো না। মুখের ভেতরে চিবোতে থাকা পানটাকে থু মেরে দূরে নিক্ষেপ করে ব্যাপারী বললো, 'মসজিদ আবার লাভের ব্যবসা ক্যামনে হয় মিয়া?'

জমিরুদ্দিন চাচা হাসলো। স্ফীত হাসি। হেসে বললো, 'সব লাভ কি আর চোখে দেহন যায় গো মিয়া ভাই?'

চাচার কথায় দমে যায় না ব্যাপারী। পুনরায় বলে, 'তোমার কথাবার্তা বুঝি না বাপু। তোমার ভালার লাগি কইছিলাম। পুলা মাইয়ার ভবিষ্যৎ আছে। তুমি বুড়া হইছ। নিজের সারাজীবনের সম্বল দিয়া যা-ও এক্কান জমি জুড়াইলা, সেইখানে আবার মসজিদ বান্ধনের ঝোঁক! তুমি চোখ বুজার পরে এই পোলা মাইয়াগো দেখবো কেডায় সেই কথা কুনোদিন ভাবছোনি মিয়া?'

আবারও মাথা তুলে তাকায় জমিরুদ্দিন চাচা। তার মুখে এখনো সেই মধুর স্ফীত হাসি। হাসিটা আনন্দের না তাচ্ছিল্যের বোঝা যাচ্ছে না। চাচা মুখে হাসি ধরে

রেখেই বললো, 'ব্যাপারী ভাই, আমারে যেমনে আল্লাহ দেখতাছে, আমার পোলা-মাইয়াগোরেও আল্লাহ দেখবো। হাত-পাও নিয়া যখন জন্মাইছে, আল্লাহর জমিনে তাগো জন্যি কী আর খাওনের অভাব হইব? আমার বাপে চইলা গেলো এমনে কইরা, আমিও যাই-যাই, আমার পোলাপানও চইলা যাইব, ইন শা আল্লাহ।'

জমিরুদ্দিন চাচার কথাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। বেশ নতুন কিছু কথা। এমন কথা আমার কিশোর মন এর আগে কখনোই শোনেনি। ছমিরুদ্দিন শুনেছে কি? বলতে পারছি না। জমির চাচা ওখানেই থেমে গেলে পারতেন। কিন্তু তিনি থামলেন না। বলে যেতে লাগলেন অনর্গল, 'আল্লাহ কুরআনে কি কইছে হুনো নাই, মিয়া ভাই? আল্লাহ কইছেন, যারাই আল্লাহর ওপর ভরসা করবো, তাগো লাইগা আল্লাহ এমন জায়গা থেইকা রিজিক পাঠাইব, যা মানুষ চিন্তাও করার পারবো না। এইডাই আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহর ওয়াদা মিথ্যা হয়, কও? আমি আল্লাহর উপরেই ভরসা করসি। আমার সন্তানগো জন্যে আমার টুপি বেচার ব্যবসাই সই। ওই ব্যবসাতেই আমার যা আয় হয় তা দিয়াই আমি চলমু। আমার পরে আমার ছেলেমেয়ে চলবো। বেচা-বিক্রি কম হইলে কম খামু। সমস্যা নাই কোনো। কিন্তু আল্লাহর ঘর বানানির যে স্বপন দেখছি মিয়া ভাই, এই স্বপন পুরা না কইরা মইরা গেলে বড় আপসোস থাইকা যাইবো'

দমে যাবার পাত্র নয় নয়ন ব্যাপারী। জমির চাচার কথাগুলোকে পাত্তা না দিয়ে বললেন, 'এমন বুজরুকি কথাবার্তা শুনতে ভালোই লাগে জমিরুদ্দিন। রিজিকের বন্দোবস্ত না কইরা যদি খালি কথাতেই পেট ভইরতো, তাইলে তো ভালাই আছিলো। কথায় বলে, অভাব যখন দুয়ারে আইসা দাঁড়ায়, ভালোবাসা তখন জানলা দিয়া পলায়।'

এবার জোরেই হেসে ফেললেন জমিরুদ্দিন চাচা। হাসতে হাসতে বললেন, 'মিয়া ভাই, যে রিজিক আসমান থেইকা আসে, তার লাগি এতো পেরেশানি কিয়ের?'

শেষ চালটা চেলেই দিলেন জমির চাচা। নয়ন ব্যাপারী আর কথা বাড়ায়নি। জমিরুদ্দিন চাচার যুক্তি এবং আবেগের কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে ভগ্ন মনোরথে প্রস্থান করলো বাড়ির উদ্দেশ্যে। কাজে আবার ডুব দিলো জমিরুদ্দিন চাচা। ছমিরুদ্দিনও একমনে কাজ করে যাচ্ছে। মাটি খুঁড়ছে। পাতিলে ভরছে। আমিও লেগে পড়লাম তাদের সাথে। মসজিদ বানানোর কাজ। শরীক হওয়ার মধ্যেই কেমন যেন আনন্দ!

দেখতে দেখতে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে জমির চাচার মসজিদ দাঁড়িয়ে গেলো। মাটির মসজিদ। ছনের পাতার ছাউনি। মসজিদের ভেতরে একটা মাদুর আর একটি জায়নামায। এই মসজিদে প্রতিদিন আযান হয়। আযান দেয় জমির চাচা। মুসল্লী দুজন। ওরা বাপ-বেটা। মুসল্লী কি কখনো বাড়বে? মানুষ কি দলবেঁধে কখনো আসবে এই স্বপ্নের মসজিদে সালাত পড়তে? প্রশ্নগুলোর উত্তর আসার আগেই প্রস্থানের সময় হয়ে এলো জমির চাচার। একদিন খুব ভোরে, সুবহে সাদিকের প্রাক্কালে জমিরুদ্দিন চাচা ইন্তেকাল করেন।

[দুই]

এরপর, অনেকগুলো দিন পার হলো। অনেকগুলো বছর। চাকরির উদ্দেশ্যে আমি পাড়ি জমিয়েছি বহুদূরের শ্বেতপাথরের দেশে। এই দেশে মস্ত মস্ত দালান। এখানে দিগন্তবিস্তৃত ফসলি মাঠ নেই, নেই একটু বসে জিরিয়ে নেওয়ার মতন শতবর্ষী পুরোনো কোনো বটবৃক্ষ। এখানে চাঁদ আর তারার মাঝে মিতালি নেই, সূর্যের প্রথম কিরণে গা ডুবিয়ে বসে থাকার আনন্দ নেই। এখানে ইটের ইমারতের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে রাতের রুপোলি চাঁদ।

মায়ের কাছে গল্প শুনি, আমাদের গ্রামও নাকি আর আগের মতো নেই। জায়গায় জায়গায় স্কুল হচ্ছে। হাসপাতাল হচ্ছে। রাস্তাঘাটগুলো পাকা হচ্ছে। শহরের সাথে তৈরি হচ্ছে সেতুবন্ধ। মা বলে, গ্রামের চেহারাটাই নাকি পাল্টে গেছে। কেমন পাল্টে গেছে কে জানে!

অনেকবছর পরে আমার বাড়ি যাওয়ার ছুটি মিললো। চোখেমুখে আমার সে কি আনন্দ! আমি ফিরে যাবো আমার মায়ের কাছে, আমার গ্রামের কাছে। যাক না পাল্টে গ্রাম! উঠুক না বড় বড় দালান সেখানে! আমার গ্রাম তো। ওখানেই যে আমার নাড়ি পোঁতা। এক অদ্ভুত টান! নাড়ির টান।

গ্রামে ঢুকেই আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লাম। এটাকে গ্রাম না বলে উপ-শহর বললেই ভালো মানাবে। আমাদের সেই অজপাড়াগাঁ, যেখানে দিনদুপুরে বিরাজ করতো মৃত্যুর মতন নিস্তব্ধতা, সেখানে এখন লোক আর লোকাচারের সে কি আওয়াজ, সে কি হই-হুল্লোড়! চারিদিকে মানুষের সে কি কর্ম-চাঞ্চল্য! একদিন যা ছিলো মরুভূমির মতো বিরান, তা এখন মুখরিত হয়ে আছে মানুষের পদাঘাতে। কাঁচা মাটির সোঁদা গন্ধ খুঁজে পাওয়া এখানে দুষ্কর হয়ে যাবে। আলোকায়নের এই

আলো ঝলমলে যুগে আমাদের গ্রাম যেভাবে আগাচ্ছে, তাতে তার শহর হতে যে আর খুব বেশি দেরি নেই, তা সহজে অনুমেয়।

একদিন হঠাৎ জমিরুদ্দিন চাচার সেই মসজিদের কথা মনে পড়লো। আমার চোখের সামনে দিয়ে যে স্বপ্ন তরতর করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল একদিন, সেই স্বপ্নের সর্বশেষ অবস্থা জানতে ব্যাকুল হয়ে উঠলো মন। একজন সরল-সিধে বৃদ্ধ মানুষের চোখে যে স্বপ্নকে সেদিন আমি ঝকমক করতে দেখেছিলাম, গোটা বিদেশ-বিভুঁইয়ে, পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে ঘুরেও সেই স্বপ্ন, সেই স্বাপ্নিক দুটো চোখ আর স্বপ্নের সেই উচ্ছ্বাস আর কোথাও খুঁজে পাইনি। ধরণির কোথাও দেখা মেলেনি আর একটা জমিরুদ্দিন চাচার।

আমি ছুটে গেলাম জমিরুদ্দিন চাচার মসজিদ দেখার জন্যে। চাচাদের বাড়ি আর আমাদের বাড়ির মাঝে যে বিশাল বিস্তৃর্ণ বিল ছিলো একসময়, সেই বিল জুড়ে এখন মানুষের ঘর-বসতি। যে পানির সমুদ্র সাঁতরে একদিন যেতে ভয় পেয়েছিলাম জমির চাচার বাড়ি, সেই অথৈ পানির বিল এখন মানুষের পদচারণায় সরগরম। বিলের মাঝ দিয়ে একটা সুন্দর, সর্পিল রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে বিলের অপর প্রান্তে। এই বিস্তৃর্ণ জলাশয়, যাতে ছিলো কচুরিপানার অবাধ রাজত্ব আর হাঁসেদের জলকেলির অভয়ারণ্য, সেটা যে একদিন এমন নগর হয়ে উঠবে তা কে জানতো?

একটা সুউচ্চ, সুবিশাল গম্বুজের ঠিক শীর্ষদেশে গিয়ে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। একটা আকাশভেদী মিনার যেন মহাশূন্যে পাড়ি জমাতে চাইছে প্রাণপণে। এটা কি নয়ন ব্যাপারীর সেই উঁচু ঢিপিটাই, যেখানে একদিন মাটি খুঁড়ার কাজ করেছি আমি, ছমিরুদ্দিন আর বয়োবৃদ্ধ জমির চাচা? স্বপ্নও কি এতোটা অবিশ্বাস্য, এতোটা বিস্ময়কর হতে পারে? নিজের চোখ দুটোকে যদি অবিশ্বাস করা যেতো আমি হয়তো তা-ই করতাম। কিন্তু যে সুদৃশ্য ইমারত আমার সামনে বর্তমান, যে আকাশছোঁয়া মিনার আমার দৃষ্টিজুড়ে, তা তো স্বপ্ন নয়, দিবালোকের মতো তা স্পষ্ট, আমার অস্তিত্বের মতোই তা সত্য।

এটাই সেই উঁচু ঢিপি এবং এটাই সেই মসজিদ। একদিন এখানেই নিজ হাতে জমিরুদ্দিন চাচা ছড়িয়ে গিয়েছিলেন স্বপ্নের বীজ। সেই স্বপ্ন-বীজ আজ মহিরুহ হয়ে আকাশ ছুঁয়েছে। এই মসজিদকে ঘিরে গড়ে উঠেছে আরও অনেকগুলো দোকানপাট। কয়েকটা স্কুল। সাথে লাগোয়া একটা সুতার কারখানা। আমি যেন

একটা অমীমাংসিত স্বপ্নের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। আমার খুব করে জানতে মন চাচ্ছে, কেমন আছে ছমিরুদ্দিন?

ছমিরুদ্দিন এখন বিশাল বড় ব্যবসায়ী। টুপি বুননের কাজটাকে সে এখন মস্ত বড় ব্যবসায় পরিণত করেছে। তার বোনের বিয়ে দিয়েছে ভালো গেরস্ত পরিবার দেখে। স্ত্রী-পুত্র আর কন্যা নিয়ে তারও এখন বনেদি সংসার।

আমাকে দেখে শুরুতেই চিনতে পারল না ছমিরুদ্দিন ভাই। আমি বললাম, 'আমারে চিনো নাই ভাই? আমি কাশেমের বাপের পোলা।' হাত উঁচিয়ে বললাম, 'ওই যে দইনের মাঠ, ঐখানেই আমগো বাড়ি। একদিন তোমাগো মসজিদ দেখবার লাগি আইছিলাম। মনে পড়ে?'

ছমিরুদ্দিন খুশিতে যেন লাফিয়ে উঠলো। বললো, 'হয় হয়! আবু তাহের না তোর নাম? কেমন আছোস ভাই আমার? কখন আইছিলি?'

ছমিরুদ্দিন ভাই আমাকে চিনলেন ঠিক ঠিক। আমার নামও মনে আছে তার। আমি বললাম, 'আইছি গনা কয়দিন হইছে। কী অবস্থা ভাই কও তো? গাও গেরাম তো চিনবার পারি না।' মসজিদের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললাম, 'এইডাই তো তোমাগো সেই মসজিদ, তাই না?'

'হ।'

চোখেমুখে এক-পৃথিবী বিস্ময় ধরে রেখে জানতে চাইলাম, 'কেমনে কী হইলো কও তো?'

হাতে থাকা হিশেবের খাতাটা বন্ধ করতে করতে ছমিরুদ্দিন বললো, 'ম্যালা কাহিনি আবু তাহের। সব কমুনে। চল আগে চা খাই।'

চা খেতে খেতে গল্প জুড়েছে ছমিরুদ্দিন ভাই। কীভাবে কী থেকে কী হয়ে গেলো তার সবিস্তার বর্ণনায় লেগে গেলো সে। এই মসজিদ, এই টুপির ব্যবসা এই পর্যায়ে আসার কাহিনি হিশেবে ছমিরুদ্দিন ভাই যা বললো তা এ রকম—'শহর থেকে কিছু মানুষ এসে এখানে একটা কারখানা করতে চাইলো। তারা পছন্দ করলো মসজিদের পাশের এই উঁচু জমিটাই। বর্ষাকালে পানি ওঠার ভয় ছিলো না বলেই তারা বেছে নেয় জায়গাটা। কারখানা হওয়ার বছরখানেকের মধ্যে এখানে আস্তে আস্তে গড়ে

ওঠে স্কুল আর মাদ্রাসা। কারখানায় যারা কাজ করতো, তারা পরিবার নিয়ে দূরদূরান্ত থেকে এখানে চলে আসতে থাকে। গড়ে ওঠে জনবসতি। লোকজনে ভরে ওঠে নির্জন অঞ্চল। তখন একটা মসজিদের খুব দরকার পড়ে যায় এলাকায়। সবাই মিলে ঠিক করলো জমির চাচার মসজিদটাকেই তারা মেরামত করে বড় করবে। ছমিরুদ্দিনের কাছে প্রস্তাব দিলে সে রাজি হয়ে যায়। সেই মসজিদ সংলগ্ন বাড়তি কিছু অংশে তারা ছমিরুদ্দিনের জন্য একটা দোকান বানিয়ে দিলো। সেই থেকে ছমিরুদ্দিন আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে টুপি বেচে না। দোকানে বসেই ব্যবসা করে। আস্তে আস্তে তার টুপির সুনাম এবং প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে শহরে। শহরের বড় বড় ডিলারেরা তার কাছে এসে টুপির অর্ডার দিয়ে যায়। বেড়ে যায় ছমিরুদ্দিনের ব্যস্ততা। খুলে যায় রিজিকের দরজা। দিন যায় আর ছমিরুদ্দিনের ভাগ্য খুলতে থাকে। একটা দোকান থেকে ছমিরুদ্দিন এখন একটা আস্ত কারখানার মালিক।

ছমিরুদ্দিন আমাকে বলতে থাকে তার ভাগ্য বদলের গল্প, আর আমার স্মৃতি অতীত থেকে তুলে নিয়ে আসে জমিরুদ্দিন চাচার ওইদিনের বলা সেই কথাগুলো। চাচা একদিন নয়ন ব্যাপারীর চোখে চোখ রেখে, পরম ভরসার পারদ বুকে নিয়ে বলেছিলেন, 'আল্লাহ কুরআনে কী কইছে হুনো নাই, মিয়া ভাই? আল্লাহ কইছেন, যারাই আল্লাহর ওপর ভরসা করবো, তাগো লাইগা আল্লাহ এমন জায়গা থেইকা রিজিক পাঠাইব যা মানুষ চিন্তাও করতে পারবো না। এইডাই আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহর ওয়াদা মিথ্যা হয়, কও? আমি আল্লাহর ওপরেই ভরসা করছি। আমার সন্তানগো জন্যে আমার টুপি বেচার ব্যবসাই সই। ওই ব্যবসাতেই আমার যা আয় হয় তা দিয়াই আমি চলমু। আমার পরে আমার ছেলেমেয়ে চলবো। বেচা-বিক্রি কম হলে কম খামু। সমস্যা নাই কোনো। কিন্তু আল্লাহর ঘর বানানির যে স্বপন দেখছি মিয়া ভাই, এই স্বপন পুরা না কইরা মইরা গেলে বড় আপসোস থাইকা যাইবো'

ধূমায়িত চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছি আর মনে পড়ছে নয়ন ব্যাপারীকে বলা জমির চাচার শেষ কথাগুলো, 'সত্যিই তো! যে রিজিক আসমান থেইকা আসে, তার লাগি এতো পেরশানি কিয়ের?'

চাওয়া না-চাওয়া

[এক]

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে তখন। যদিও বৃষ্টির মৌসুম নয়; অবেলার বৃষ্টি। অবেলার বলেই হয়তো বা বড্ড বেপরোয়া প্রকৃতি। নিকষ-কালো মেঘে ছেয়ে আছে মাথার ওপরের আকাশ। যেন ভীষণ অনিয়মে পৃথিবীতে নেমে এসেছে রাত্রি-প্রহর।

আমাদের ঘরে টিমটিমে একটি আলো জ্বলছে। বাতাসের ঝাপটায় নিভু নিভু অবস্থা; বাতাস একটু কমলেই সজোরে, ভীষণ বিস্ফোরণে সমস্ত শক্তিসমেত সেটা দপ করে জ্বলে ওঠে। বাতাস আর কুপি-বাতির মধ্যে যেন অলিখিত কোনো যুদ্ধ লেগেছে; কার শক্তি বেশি তা প্রমাণে উভয়পক্ষ বিলকুল মরিয়া।

আমাদের মাটির ঘর। বাতাসের আঘাতে আলোর ছিন্নভিন্ন অংশ জানালার ভেতর দিয়ে দাওয়ায় আছড়ে পড়েছে। সেই আলোতে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি আমরা চার জন। আমি, বড় আপা, রুমু আর মারুফা। আমাদের মধ্যে বড় আপার ছটফটানিটাই সবচেয়ে বেশি। সে একটু পরপর জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ঘরের ভেতর। তার চোখেমুখে আশা আর ভয়ের এক অদ্ভুত সমন্বয়। বড় আপা কেন যে ভয় পাচ্ছে জানি না। কী নিয়ে সে এতো আশা করে আছে তাও আমার ধারণার বাইরে। এই ঘন-ঘোর বৃষ্টি-বাদলের দিনে কেনই বা ঘরের ভেতরে আমাদের থাকার অনুমতি মিলছে না তাও বোধগম্য হচ্ছে না কোনোভাবে। রুমু পুতুল-খেলায় ব্যস্ত। আজ এই বান-বাদলের দিনে তার পুতুলের বিয়ে হচ্ছে; আদরের পুতুল-কন্যাকে কীভাবে

সে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবে তা নিয়ে তার কপালে চিন্তার ভাঁজ। মারুফার সেদিকে কোনো মন নেই। সে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে; সম্ভবত কালো মেঘেদের ছুটোছুটিতে সে ভীষণ আনন্দ পাচ্ছে।

মাকে দেখা যাচ্ছে না আজ; মনে হয় কোনো কাজে ভীষণ ব্যস্ত। কিন্তু এমন দুর্যোগের দিনে মা একটিবার আমাদের খোঁজ নেবে না, তা কী করে হয়? মায়ের কি তাহলে কোনো অসুখ করেছে? বড় কোনো অসুখ? যে অসুখ হলে বিছানা ছেড়ে ওঠা যায় না?

শব্দ করে কথা বলা যাবে না; বড় আপার নির্দেশ। একটু আগেই সে আমাদের কড়া শাসনের সুরে বলে রেখেছে, 'খবরদার! কোনো শব্দ করিস নে যেন!'

বড় আপার কড়া শাসনের শব্দে আমরা তিনজনই চুপ মেরে গেলাম। কিন্তু মাকে তো অনেকক্ষণ হয় কোথাও দেখছি না। নিদেনপক্ষে তার গলার আওয়াজ হলেও শোনার কথা। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে বড় আপার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললাম, 'মায়ের কি অসুখ করেছে আপা?' সে আমার চাইতেও নিচু স্বরের ফিসফিসানি আওয়াজে বললো, 'না।'

'তাহলে?'

'তাহলে কী?'

'মাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না যে?'

বড় আপা খানিকক্ষণ চুপ মেরে রইলো। যেন জটিল এক প্রশ্নের মুখোমুখি এনে ফেললাম তাকে। কিছুক্ষণ ভাবনা-চিন্তা করে আমার দিকে মুখ ফেরালো সে। আমার সতৃষ্ণ দৃষ্টিকে উপেক্ষা করা যাবে না দেখে বড় আপা বললো, 'দেখবি। আরেকটু অপেক্ষা কর।'

আরেকটু অপেক্ষা? ঠিক কতোক্ষণ অপেক্ষা করে থাকলে মিটে যাবে আরেকটু অপেক্ষার প্রহর? এই অনির্ধারিত, অমীমাংসিত, অনির্দিষ্ট 'আরেকটু' সময়কে পার করার জন্যে নতুন করে অপেক্ষার তপস্যা শুরু হলো মনে।

হঠাৎ খটখট আওয়াজ করে খুলে গেলো ঘরের সদর-দরজা। দরজা খুলে যেতেই ভেতর থেকে হনহন করে হেঁটে বেরিয়ে এলেন এক বয়স্ক মহিলা। চেহারায় তার

প্রৌঢ়ত্বের ছাপ। এসেই বড় আপার কানে কানে ফিসফিসিয়ে কী যেন বললেন। বড় আপা এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করে কতোগুলো জিনিস জোগাড় করে মহিলার হাতে দিতেই সেগুলো নিয়ে তিনি আবার হনহন করে ঘরের ভেতরে ঢুকে ধড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিলেন। আমরা আরেকবার আলাদা হয়ে গেলাম। হয়তো বা আরও খানিকটা দীর্ঘায়িত হলো আমাদের অপেক্ষার প্রহর।

বড় আপা এবার নিজ থেকেই কথা বললো। ফিসফিসিয়ে নয়; বরং একটু জোরেই। বললো, 'চল, আমরা হাত তুলে দুআ করি।'

আমি বললাম, 'দুআ করবো কেন? মায়ের তো অসুখ করে নাই।'

বড় আপার চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; আমার এমন অকপট প্রশ্নের প্রশ্রয়ে বড় আপা সম্ভবত খুশি হতে পারেনি। চেহারা থেকে বিরক্তির রেশটুকু গলার মধ্যে টেনে নিয়ে, বেশ কর্কশ গলায় সে বললো, 'বড্ড কথা শিখেছিস! অসুখ হলেই খালি মানুষ দুআ করে?'

বড় আপার কথায় ভরসা আছে। তাকে কোনোদিন মিথ্যে বলতে দেখিনি আমরা। আজও যে মিথ্যে বলছে না সেটা জানি। কিন্তু, তাও মনে হচ্ছে আমি কিছু একটা জানতে পারছি না, অথবা আমাকে জানানো হচ্ছে না। কেন কে জানে! তবুও ফ্যালফ্যাল করে বড় আপার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মায়ের অনুপস্থিতিতে আপাই আমাদের সব। তার অনুগত থাকা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে আমাদের। আমার কৌতূহলী অথচ করুণ চেহারার দিকে তাকিয়ে আপার সম্ভবত মায়া হলো। মুখভরা একটা হাসি দিয়ে আমার দিকে তাকালো বড় আপা। তার হাসিতে এতোক্ষণের গুমোট পরিবেশে মুহূর্তে প্রাণের হিল্লোল দোল খেলো যেন! আকাশ মেঘে ভর্তি, তবু মনে হচ্ছে চারদিক খুব হালকা। দুর্যোগের এই ঘনঘটার দিনেও বড় আপার মুখের এই হাসি অনেক কিছুর ইঙ্গিত দেয়। চিন্তায় পড়ে যাওয়ার মতো কোনোকিছু মায়ের হয়নি। যদিও কিছু হয়ে থাকে, তা অবশ্যই ভালো কিছু। ভালো কিছুই যে হতে চলেছে, সেই সংবাদ একটু পরে আপার মুখ থেকেই শুনলাম অবশ্য। আমাদের ভাই-বোনদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে আপা একটা নির্মল, নিরুদ্বেগ হাসি দিয়ে বললো, 'আমাদের ঘরে আরেকটা বাবু আসবে রে।'

আমাদের ঘরে নতুন বাবু আসার সংবাদে সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছে রুমু। তার ধারণা, আসমান থেকে টুপ করে একেকদিন আমরা আমাদের ঘরের ভেতরে এসে

পড়েছি। বড় আপা, আমি, মারুফা এবং সে—আমরা সবাই। কিন্তু আজ যে ঘরের দরজাই বন্ধ। দরজা বন্ধ থাকলে আসমান থেকে বাবুটা কোথায় এসে পড়বে? চোখেমুখে বিস্ময় ধরে রেখে রুমু আবার পুতুল-খেলায় মন দিলো। একটু পরেই রুমুকে বর-যাত্রী বিদেয় করতে হবে। তার হাতে এখনো কতো কাজ! মারুফাও চুপচাপ। বড় আপার কথায় তার মধ্যে কোনো ভাবাবেগ দেখা গেলো না।

বাইরে এখনো অঝোর ধারার বৃষ্টি। কিন্তু সেই বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে, একটা নতুন কান্নার আওয়াজ বাতাসের কাঁধে ভর করে ভেসে এলো আমাদের কানে। বুঝতে দেরি হলো না যে নবজাতকের কান্না! কান্নার সেই শব্দে আমি প্রায় আঁতকে উঠেছি বলা চলে। চোখভরা বিস্ময় নিয়ে কান্নার অকুস্থলের দিকে তাকিয়ে আছে রুমু। ঘরের দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও আসমান থেকে কোনদিকে বাবুটা ঘরে এসে পড়েছে তা সে বুঝে উঠতে পারছে না। আজ সম্ভবত রুমুর বিস্মিত হবার দিন। মারুফাও ঘাবড়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কোনো সাড়া-শব্দ ছাড়াই সে চোখের পলক না ফেলে কান্নার আগমন-স্থলের দিকে তাকিয়ে আছে।

বয়স্ক মহিলাটা দরজা খুলে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। বড় আপাকে লক্ষ করে বললো, 'মিনু, তোর বইন হইছে।'

আমাদের আরেকটা বোন হয়েছে। রুমু আর মারুফার আরও একজন খেলার সাথির আবির্ভাব ঘটেছে দুনিয়ায়। কিন্তু বড় আপার দিকে তাকাতেই তাকে বেশ বিমর্ষ দেখালো। তার বিপন্ন মুখাবয়বের কোথাও যেন কোনো অনিশ্চিত বিপদের সংকেত। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, খুব অপ্রত্যাশিত কোনো ব্যাপার ঘটে গেছে, যার জন্য আমাদের কোনো প্রস্তুতি ছিলো না।

বৃষ্টির থামাথামির কোনো নামগন্ধ নেই। এরই মধ্যে কাজের পাওনা হিশেবে বয়স্ক ধাত্রী মহিলা কিছু চাল নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে মাথার ওপর অর্ধ ছেঁড়া একটা ছাতা ছাপিয়ে বেরিয়ে পড়লো। আমাদের নতুন অতিথি এসেছে অনেকক্ষণ হয়ে গেলো। মা পাটিতে শুয়ে আছে। তার পাশে আগত নতুন মেহমান। রুমু পুতুল বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মারুফাও আরেকটু দূরে, বিছানো চাটাইতে হাত-পা গুটিয়ে বেশ আরাম করে ঘুমুচ্ছে। আমি আর বড় আপা বসে আছি মায়ের পাশে। বাইরের আকাশের মতো মায়ের চেহারাতেও একটা বিষণ্ণতার ছাপ। আমাদের অধীর অপেক্ষা বাবার জন্যে। প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও দিনের বেলায় বাবা বাসায় নেই।

ভারী বর্ষণ একটু কমলো বটে, তবুও বাইরে গেলে গা ভিজে ছপছপ করবে। এরই মধ্যে, হুড়মুড় করে উঠোন ভেঙে বাবার আবির্ভাব হলো। বাবাকে খুব ভয় পাই আমরা। তার ভারি লাল লাল চোখ। পাথরের মতো শক্ত দু-খানা হাত। আমরা জানি, বাবার শক্ত হাতের কিল খেলেই আমাদের গায়ে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর উঠে যায়। তাই বাবার কাছে কখনোই কোনো আদিখ্যেতা করার সাহস আমাদের কারও হয় না। বাবাকে সবচাইতে বেশি ভয় পায় মা। বাবার উপস্থিতিতে যেন মায়ের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। মায়ের এই ভয়ের কারণ আগে বুঝতাম না, কিন্তু আজকাল বুঝি। পান থেকে চুন খসলেই বাবার যে ভয়ংকর রূপ বেরিয়ে পড়ে, তাকে ভয় না করে উপায় কী? মায়ের পরে বাবাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় বড় আপা। এরপর আমি। তারপর কে? সম্ভবত রুমু। মারুফা কি বাবাকে ভয় পায়? জানি না।

এরপরের ঘটনা খুব নাটুকে। নতুন কন্যাসন্তানের আগমন-বাণী শুনে বাবার সে কী তর্জন-গর্জন। বাবার এমন বীভৎস রূপ, এমন ভয়ংকর চেহারার কাছে বাইরের অশান্ত প্রকৃতিও যেন মামুলি! বাবার তাণ্ডবের কাছে কালবোশেখির মেঘের তাণ্ডবও যেন ফিকে হয়ে আসে।

এরপর কী থেকে যে কী হয়ে গেলো, কিছুই ভালোমতো বুঝে ওঠা গেলো না সেদিন। আমার মা, নিদারুণ প্রসববেদনা সহ্য করে যে খানিক আগেই জন্ম দিয়েছে একটি মানব-সন্তান, তাকে আমি আবিষ্কার করেছি উঠোনের মাঝে। জড়সড় অবস্থায়; কাঁদায় মাখামাখি। মা উঠে দাঁড়াতে পারছে না কোনোভাবে। উঠতে গেলেই ককিয়ে কেঁদে উঠে আবার মাটিতে ধপাস করে পড়ে যাচ্ছে। বড় আপা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ঘরের এক কোণে। ভয়ার্ত চোখমুখ নিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে আছে আমার দুটো বোন। রুমু আর মারুফা। নতুন যে এসেছিল, সেও চিৎকার জুড়েছে সমানতালে। ঘরে বাইরের এই সীমাহীন সংকটের সামনে আমি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আবারও ভারী বর্ষণ শুরু হয়েছে। সেই বর্ষণের মাঝে কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়েছে আমার মা। মা কি কাঁদছে? অঝোর বৃষ্টিতে তা বোঝা মুশকিল। তাকে খুব অসহায় আর বিপন্ন দেখাচ্ছে। মাকে এই মুহূর্তে হতবিহ্বল হরিণীর মতন মনে হচ্ছে; বাঘের তাড়া খেয়ে যে ক্লান্ত, পিপাসার্ত। সংসারের সীমাহীন সংকটে যে মহিলা বটবৃক্ষ হয়ে আগলে রেখেছিল আমাদের, আজ তাকে এমন বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত দেখে আমার বুকের কোথাও যেন হুহু কান্নার রোল পড়ে গেলো।

এই ঘন-ঘোর বর্ষার বর্ষণের মাঝে উঠোনে নেমে মায়ের হাত ধরে বললাম, 'ঘরে চলো, মা।'

হাত ধরতেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো আমার মা। আমি দেখলাম, মায়ের চোখ বেয়ে নেমে আসছে নোনা জলের স্রোত; এই স্রোত যেন শ্রাবণ-ধারার জলকেও হার মানিয়ে দেয়। যেন অনেক কষ্টে বাঁধ দিয়ে রাখা জোয়ারের জল, শেষ চেষ্টাটুকু করেও আর যাকে আটকানো গেলো না। আমি মায়ের বুকের সাথে লেপ্টে রইলাম। এই স্নেহময় বুকে এক প্রলয়ংকরী ঝড় উঠেছে, যা কালবোশেখির ঝড়ের চাইতেও প্রবল। মহাসাগরের বুকে মহাদুর্যোগের সময় যে ঝড় ওঠে, সেই ঝড়ও মায়ের বুকের ঝড়ের কাছে নস্যি। সেদিন মা আমাকে মুখ ফুটে একটা কথাই বলেছিলো, 'তোর বাপের মতো হোস নে, বাবা।'

[দুই]

আজও বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। ঝড়ো হাওয়ায় লন্ডভন্ড প্রকৃতি। আমি দাঁড়িয়ে আছি অপারেশান থিয়েটারের করিডোরে। ভেতরে আমার স্ত্রী রেবেকা। প্রচণ্ড প্রসব-বেদনায় সে কাতর। অপারেশান থিয়েটারের দরজার ফাঁক গলে আসা তার চিৎকার আমার বুকের ভেতরটাকে ভেঙে খান খান করে দিচ্ছে। আজ আমাদের ঘরে নতুন আলো আসার দিন। ভয়, আশা আর আনন্দের ত্রিমুখী সংঘর্ষে আমি বিধ্বস্ত। বাইরের প্রকৃতির মতোই ছিন্নভিন্ন প্রায়। আমার মনে পড়ে যায় শৈশবের কথা। একদিন, এমন এক ঘন-ঘোর বরষা এবং আমার মা। আমি আর ভাবতে পারি না কিছুই। আমার মনে পড়ে যায় বড় আপার কথা, যে বছরখানেক আগে মরণ-জ্বরে মারা গেছে। সেদিন, সেই কালবোশেখি ঝড়ের দিনে আপা বলেছিলো, 'চল, আমরা দুআ করি।' সেদিনও অঝোর ধারার বৃষ্টি ছিলো। আচ্ছা, আপা কি জানতো বৃষ্টির সময় দুআ করলে সেই দুআ আল্লাহ কবুল করেন? হয়তো জানতো। সেদিন কি আমি সত্যিই কোনো দুআ করেছিলাম? আমার মনে পড়ে না।

আমি আসমানের দিকে হাত তুলে বললাম, 'পরওয়ারদিগার, আমার স্ত্রীকে ধৈর্য দিন। এই ভীষণ ব্যথা সইবার শক্তি তাকে দিন। আর, আমাকে কন্যাসন্তান দান করুন। আমি কন্যার বাবা হতে চাই।'

আজও বৃষ্টির কোনো থামাথামি নেই। আকাশে কালো মেঘের অবিরাম ছুটোছুটি। হঠাৎ মধুর এক কান্নার আওয়াজ! নতুন এক প্রাণের আবির্ভাবের সংকেত। আমার

CamScanner

বুকের ভেতরে উথাল-পাথাল অবস্থা। কেমন আছে রেবেকা? আর, নতুন যে এলো সে?

একজন নার্স ছুটে বেরিয়ে এলো অপারেশান থিয়েটার থেকে। তার মুখ উজ্জ্বল। সে হাসিমুখেই বললো, 'আপনার মেয়ে হয়েছে।'

আমি তখন আনন্দে আত্মহারা! আল্লাহ আমার দুআ শুনেছেন? আমাকে কন্যার বাবা বানিয়েছেন? এতো দ্রুত আমার দুআ আসমান ভেদ করে আরশের মালিকের দরবারে পৌঁছে গেলো?

নার্স আরেক দৌড়ে বাবুটাকে নিয়ে এলো আমার কাছে। আমি ভালো করে দেখলাম তার চেহারা। দেখতে ঠিক যেন আমার মায়ের মতো। আমার মা, যে বুকের ব্যথায় কোঁকাতে কোঁকাতে আমার সামনে মারা গিয়েছিল। আমার কোল আলো করে যেন আমার মা-ই ফিরে এসেছে নতুন করে। সেই মা, যে কাকভেজা বৃষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে, আমাকে বুকের সাথে জড়িয়ে বলেছিলো, 'তোর বাপের মতো হোস নে, বাবা।'

আমি চুমু খেলাম আমার ছোট্ট মায়ের কপালে। সে চোখ মিটমিট করে আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, 'মা দেখো, আমি আমার বাবার মতন হইনি।'

এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যা

আগেরদিন বিকেলে একসাথে বসে চা খাওয়া বন্ধুটি যখন পরেরদিন না ফেরার দেশে চলে যায়, সেই শোক সামলানোর জন্য ঠিক কীরকম মানসিক প্রস্তুতি দরকার? মাঝে মাঝে মৃত্যুকে ভারি আশ্চর্য লাগে! বুকের বাম পাশে ধুকপুক ধুকপুক করতে থাকা হৃৎপিণ্ডটা থেমে গেলে ভবলীলাটাই সাঙ্গ হয়ে যায়। মুহূর্তেই চেনাজানা একটা মানুষ হয়ে যায় অন্য জগতের বাসিন্দা।

বন্ধু জাহিদের মৃত্যুসংবাদ শোনার সাথে সাথে আমি যেন বরফের মতো জমে গেলাম। মনে হলো—আমার সমস্ত চিন্তাশক্তি স্থবির হয়ে গেছে। পাল্টে গেছে পৃথিবীর গতিপথ, থেমে গেছে পৃথিবীর চিরাচরিত ঘূর্ণন। ভীষণ বিপন্ন হয়ে ভেঙে পড়েছে মহাবিশ্বের সকল মহাকর্ষীয় শক্তি। প্রাণ-চঞ্চল ধরণির কোথাও যেন আর এতোটুকুও প্রাণের স্পন্দন নেই।

'জাহিদ বেঁচে নেই'—ব্যাপারটা যেন কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। মৃত্যুর এমন আকস্মিক আক্রমণে আমি বিপন্ন আর বিপর্যস্ত। মৃত্যু যে এতোখানি অনিশ্চিত এবং এতোখানি আকস্মিক—তা চিন্তা করতেও আমার নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে যেন।

চারপাশে নিত্যদিন কতো মানুষকেই তো মরতে দেখি। রোগে-শোকে প্রতিদিন কতো মানুষই তো মৃত্যুর মিছিলে ভিড় জমায়। কতো মৃত্যু-সংবাদ রোজ কানের পর্দায় এসে জানান দিয়ে যায় অস্থায়ী জীবনের অমোঘ বাস্তবতার। কিন্তু সেই মৃত্যুকে এতোটা কাছ থেকে দেখা হবে এতো শীঘ্রই—তা যেন কল্পনাতীত!

জাহিদের মৃত্যুটা আমাকে নাড়া দিয়ে গেলো ভীষণভাবে। আমি ব্যাধিগ্রস্ত জীর্ণ বৃদ্ধের মতো সমস্ত মনোবল সমেত ভেঙে পড়লাম যেন। এই শোক, এই বিরহ-ব্যথা সামলে উঠবার কোনো শক্তি আমি খুঁজে পেলাম না।

তবে, আমাকে সাহস দিতে কার্পণ্য করলো না আমার স্ত্রী ফাতিমা। জাহিদের মৃত্যুতে সেও হতভম্ব এবং আমার মতোই শোকে বিহ্বল; কিন্তু এ বেলায় তার ধৈর্যশক্তি আমার চাইতে প্রবল এবং প্রচণ্ড। চেহারায় তার বিষণ্ণতার ছাপ, তবু সে পরম বিশ্বাসের সাথে আমার সামনে পাঠ করলো এই আয়াত, 'কুল্লু নাফসিন যা-ইকাতুল মাউত।'

তাই তো! কি আশ্চর্য, সারাজীবন মানুষকে বলে আসা, পড়ে আসা এই অমোঘ সত্য-বাণীটা প্রয়োজনের সময়ে আমার মনে রেখাপাত করলো না কেন? আমি কেন বিস্মৃত হলাম, কেন ভুলে গেলাম এই নির্জলা সত্যটাকে?

আমার মনে পড়ে গেলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু-দিনের সেই ঘটনাটা যখন এমনিভাবেই মৃত্যুর মতো পরম নিশ্চিত ব্যাপারে বিস্মৃত হয়েছিলেন ধরণির একজন মহাপুরুষ—উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু। সেদিন তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু হতে পারে! শুধু বিস্মৃতই নয়, এই মৃত্যু-সংবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল তার সহজাত তেজ এবং তলোয়ার। যারাই বলবে নবিজির মৃত্যু হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধেই তিনি জারি করে রাখলেন মৃত্যুর পরোয়ানা। প্রিয় মানুষের বিরহ এবং বিদায় যদি তার মতো মানুষকেও ভুলোমনা বানাতে পারে, সেখানে আমি আবার কোন ছার?

পৃথিবীতে তিন ধরনের মানুষ আছে। একদল সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে, আরেক দল করে না। আবার, এই দুই দলের মাঝামাঝি একটা দল আছে। তারা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসও করে না, আবার অবিশ্বাসও করে না। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী এবং সংশয়বাদী যা-ই হোক না কেন—সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি চললেও জগতের একটা ব্যাপার নিয়ে কারও মধ্যে কোনো বিরোধ কিংবা দ্বিমত নেই। সেটা হলো মৃত্যু। পৃথিবীর ইতিহাসে দম্ভভরে অনেকেই নিজেকে খোদা দাবি করবার দুঃসাহস দেখিয়েছে; কিন্তু নিজেকে খোদা বলে দাবি করা লোকটাও নিজের নশ্বর অস্তিত্বকে কোনোদিন একমুহূর্তের জন্য অস্বীকার করতে পারেনি। জনসম্মুখে না হোক, নির্জন নিরালায় তার মনে মৃত্যুর একটা তাগাদা থাকত ঠিকই। মৃত্যু বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধার ধারে না। সে তার দম্ভের মতো অমোঘ, সে তার শক্তির মতো অবশ্যম্ভাবী।

জাহিদ আমার বাল্যকালের বন্ধু। আমরা একসাথে পড়াশোনা করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে আমি আমেরিকা চলে গেলেও শিকড়ের টানে দেশেই রয়ে যায় সে। জাহিদের ছিলো শিক্ষক হবার দুর্নিবার নেশা। দেশে এসে দেখি সে ব্যবসা করছে। সারাজীবন চিরকুমার থাকার পণ করে থাকা জাহিদকে আমি আবিষ্কার করলাম একটি কন্যাসন্তানের বাবা হিসেবে। ছোটোবেলার কোনো কথাই সে রাখতে পারেনি। জীবনে সে যতো রকমের ওয়াদা করেছে তার সবটাই তাকে ভাঙতে হয়েছে। খুব ছোটোবেলায়, পাটোয়ারীদের পেয়ারা গাছে বসে, পা ঝুলাতে ঝুলাতে আমাকে ছেড়ে না যাওয়ার ওয়াদা করেছিলো সে। অথচ সেই ওয়াদাও রাখা হলো না তার। আজ সে আমাকে রেখেই চলে গেছে। কবির ভাষায়, 'চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়।' সত্যি কি তা-ই? জাহিদ কি আর কখনোই ফিরে আসবে আমাদের মাঝে? আর কি কখনো আমরা একসাথে শাপলা তুলতে বেরুবো? ঝড়-বাদলের দিনে একসাথে আম কুড়ানো, স্কুল ফাঁকি দিয়ে মাঠ-তেপান্তর চষে বেড়ানো আমার সোনালি অতীতের বন্ধুটা কি আর কখনো এসে দরজায় কড়া নেড়ে বলবে, 'তাড়াতাড়ি আয়, নইলে কিন্তু তোকে রেখেই চললাম?' বলবে না। মৃত্যু মানেই হলো নিশ্চিত প্রস্থান।

জাহিদকে একবার খুবই বিমর্ষ অবস্থায় পেলাম। মুখের কোণে সারাক্ষণ হাসি ধরে রাখা বন্ধুটাকে এমন অবস্থায় দেখে আমার মনটাও ভারি হয়ে উঠলো। জিগ্যেশ করলাম, 'কী ব্যাপার? তোকে এতোটা বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন? কোনো সমস্যা?'

মায়াভরা চোখে সে আমার দিকে তাকালো। চোখ তার জ্বলে টলমলো। ভারী বর্ষণের খানিক আগে আকাশ যেমন গুমোট আকার ধারণ করে—সেরকম। বুঝতে পারলাম কোনো সমস্যা হয়েছে এবং সমস্যাটা খুবই গুরুতর। রাগত গলায় আমি বললাম, 'ভারি আশ্চর্য! কী হয়েছে সেটা তো বলবি, নাকি? এমন বোবা হয়ে থাকলে বুঝবো কী করে?'

আমার কথা শেষ হতে না হতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল জাহিদ। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। কোনোরকমে তাকে শান্ত করে বললাম, 'জাহিদ, তুই না বড্ড সাহসী আর সংযমী? এভাবে ভেঙে পড়লে হয়? আমাকে বল না কী হয়েছে? আমি না তোর সবথেকে প্রিয় বন্ধু?'

তার চোখের জলের অবিরাম বর্ষণ তখনো বন্ধ হয়নি। অশ্রুসিক্ত নয়নে সে আমার হাত দুটো ধরে বললো, 'আমার মেয়েটার ব্রেইন টিউমার হয়েছে রে। চোখের সামনেই সে আস্তে আস্তে জটিল অবস্থার দিকে যাচ্ছে। বাবা হয়ে আমি ঠিকমতো

তার চিকিৎসাও করাতে পারছি না। বিশ্বাস কর বন্ধু, মেয়েটার কিছু হলে আমি আর তোর ভাবি, আমাদের কেউই হয়তো বাঁচবো না', বলতে বলতেই জাহিদ আবারও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। আমার শক্ত-সামর্থ্য মনের বন্ধুটাকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখে আমিও ভেতরে ভেতরে খান খান হয়ে যাচ্ছি।

আমাদের কোনো সন্তানাদি নেই। সন্তানের জন্য বাবা-মায়ের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা উপলব্ধি করবার সুযোগও তাই মেলেনি কোনোদিন। মেয়ের জন্য জাহিদের এমন হৃদয়-নিংড়ানো আবেগ আর দরদ দেখে অনুধাবন করলাম এই অপার্থিব ভালোবাসা পৃথিবীর কোনো শব্দ-বন্ধনী, কোনো বাক্য-বিন্যাসে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'দেখ, এভাবে ভেঙে পড়লে তো চলবে না। রোগ যেমন আছে, তার চিকিৎসাও আছে। তুই চিন্তা করিস না জাহিদ। আল্লাহ চান তো তোর মেয়ের কিচ্ছু হবে না। ও ঠিক ঠিক সুস্থ হয়ে উঠবে।'

বিপদের দিনে মানুষকে আশার আলো দেখাতে হয়। যেখানে অন্ধকার ব্যতীত আলোর নিশানাও নেই, সেখানেও আলোর উপস্থিতি কল্পনা করে নিতে হয় আমাদের। মানুষ আশা করতে পারে বলেই সে এতো বিচিত্র বিপদেও সভ্যতার পর সভ্যতা ধরে টিকে আছে।

জাহিদের সাথে কথাগুলো হয়েছিলো বেশ আগে। এরপর দীর্ঘদিন আমাদের কোনো যোগাযোগ হয়নি। যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় কেউ কারও খোঁজ-খবরও নিতে পারিনি সেভাবে। মতিঝিলে গতকাল অকস্মাৎ মুখোমুখি দুজনে। দুজনেই দৌড়ের ওপর ছিলাম একপ্রকার। জাহিদকে দেখলাম বেশ ফুরফুরে মেজাজেই আছে। টং দোকানে চা খেতে খেতে হালকা আলাপ হলো বটে, কিন্তু সেই প্রাণবন্ত আলাপের কোথাও দুঃখ-বেদনার কোনো উপস্থিতি টের পাইনি।

এরপর? এরপর আজ তার মৃত্যুসংবাদ! (আহা মৃত্যু! আহারে মানুষ! কচুপাতার ওপর জমে থাকা শিশিরবিন্দুর মতোই ঠুনকো মানুষের জীবন। হালকা বাতাসে পাতা দুললেই গড়িয়ে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।)

হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছে জাহিদের। কী জানি ওই বুকের ভেতর কতো রকমের বোঝা চেপে রেখেছিল সে। গতকালকের জাহিদকে আজ অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণে ডাকতে হবে। মৃত জাহিদ। লেইট জাহিদ। গতকালকের জাহিদ আজ

কেবলই একটা নির্জীব, অনড় পদার্থ। গতকালকের মানুষটা আজ কেবলই লাশ! জীবনের পরিণতি কতটা নিষ্ঠুর হয় তা যদি আমরা অনুভব করতাম!

জাহিদের মৃত্যুর সাথে সাথে তার মেয়েটার চিকিৎসা বন্ধ হয়ে গেলো। যাদের সাথে ব্যবসা করতো সে, তারাও নানান অজুহাতে সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে পালাবার ধান্দায় ব্যস্ত। মৃত্যুর সাথে সাথে নামে-বেনামে বেরিয়ে এলো অনেক পাওনাদার। কোথায় জানি একবার পড়েছিলাম, 'জীবিতকে নিয়ে ব্যবসা চলে, মৃতকে নিয়ে নয়।' এই অসত্য, অযৌক্তিক কথাখানি যিনি বলেছিলেন সেই ভদ্রলোক বেঁচেবর্তে আছেন কি না জানা নেই। থাকলে তাকে আজ দেখানো যেতো মৃত মানুষকে নিয়েও এখানে কতো রমরমা ব্যবসা হয়!

জাহিদের মৃত্যুর মাস তিন পেরুতে না পেরুতেই বাড়িওয়ালার কড়া নোটিশ হাজির—আগামী মাসে বকেয়া এবং চলতি পাওনা পরিশোধ না করা গেলে অন্যত্র বাসা খুঁজতে হবে, তবে অতি-অবশ্যই পাওনা অনুযায়ী বাসার আসবাবপত্র বাড়িওয়ালা রেখে দেবেন। ওদিকে ব্যবসার অংশীদারেরাও কম যান না একদম। ব্যবসায় বিরাট ক্ষতি আবিষ্কার করে তারা ইতোমধ্যেই ব্যবসার চুক্তিপত্র থেকে জাহিদের নাম কর্তন করতে কার্পণ্য করেননি।

ঢাকা শহর, যেখানে খাবার পানিটাও কিনে খেতে হয়, সেখানে বুঝি এই অবস্থায় ব্রেইন টিউমারের চিকিৎসা হবে? অবস্থা এমন—বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে পথে বসা ছাড়া জাহিদের বউয়ের আর কোনো গত্যন্তর নেই। আমাদের অবস্থাও তেমন আহামরি কিছু নয়। মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি। কোনোরকমে নিজেদের ভরণপোষণ সামলে বাড়তি কারও দায়িত্ব কাঁধে নেবো—সে সাধ্যি কই? তবুও যে তাদের একেবারে ত্যাগ করেছি তা নয়। সামর্থ্য অনুযায়ী পাশে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা তো ছিলোই।

আমার হালকা কিছু সঞ্চয় ছিলো। মনে হলো ওই টাকা দিয়ে জাহিদের অসুস্থ মেয়েটার চিকিৎসা করানো যায়। একদিন আমার হাত ধরে মেয়ের জন্য অঝোর ধারায় যেভাবে কেঁদেছিল জাহিদ—সেই দৃশ্যের কথা মনে পড়লে বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে। জাহিদ আজ নেই, কিন্তু মেয়েটাও যদি ধুঁকে ধুঁকে শেষ হয়ে যায়—নিজের কাছে নিজেই তখন ছোটো হয়ে যাবো আমি।

ভাবনাটা ফাতিমাকে জানালাম। ফাতিমা খুবই সরল মনের মানুষ। দীর্ঘ সাংসারিক জীবনে তাকে আমি কখনোই কঠোর হতে দেখিনি। মানুষের বিপদে-আপদে পাশে

দাঁড়াবার সে কি আকুল আগ্রহ তার! তার সেই আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করে রাখত। মনে হতো—আমার যদি একদিন অনেক টাকা হয়, আমি অনেক বড় একটা চ্যারিটি ফাউন্ডেশন করে যাবো যেখান থেকে দুঃখী-দুঃস্থ মানুষেরা সাহায্য পাবে। ফাউন্ডেশনটার নাম হবে—'ফাতিমা চ্যারিটি ফাউন্ডেশন'। ফাতিমা যখন শুনবে আমি আমার একমাত্র সঞ্চয় ব্যয় করে একটা অসহায় পরিবারের অসুস্থ মেয়ের চিকিৎসা করাতে চাচ্ছি—আমি নিশ্চিত এটা শুনে ফাতিমার চাইতে সুখী এবং খুশি আর কেউ হবে না।

কিন্তু আমার কথা শুনে একপ্রকার আমার মুখের ওপরে সে বললো, 'এটার কোনো দরকার নেই।'

আমি বেশ অবাক হলাম! এমন একটা প্রস্তাবে ফাতিমা রাজি হবে না—এ তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। দু-হাতে দান করতে পারলে যে মানুষটি সুখ পায়, অসহায়ের পাশে দাঁড়াতে যার ব্যাকুল থাকে মন—সে কিনা আমার মুখের ওপরে 'না' বলে দিলো! নরম হৃদয়, সরল আর শুভ্র মনের অধিকারিণী যে ফাতিমাকে আমি চিনি, যাকে আমি ভালোবাসি, বিশ্বাস আর ভরসা করি—এ কি সে-ই?

তার পাশে বেশিক্ষণ বসে থাকা গেলো না। দুনিয়াটা কেমন যেন বিস্বাদ ঠেকছে। জগতের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্ত বোধকরি এটাই। মনে মনে বিড়বিড় করে বললাম, 'ফাতিমা, তুমিও এভাবে বদলে যেতে পারলে? স্বার্থপরতার মোহ থেকে তুমিও বাঁচতে পারলে না?'

পরিস্থিতিটা কেন জানি সহ্য হচ্ছিল না। দ্রুত স্থান ত্যাগ করার জন্যে পা বাড়াতেই আমার হাত ধরে ফেলল ফাতিমা। আমাকে আগের জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বললো, 'আমার কিছু কথা আছে আপনার সাথে।'

আমি কোনোকিছুই বললাম না তাকে। আজ তাকে আমার কিচ্ছু বলার নেই। স্বার্থপরতার যে রূপ আজ আমি তার মাঝে দেখলাম, সেই রূপের তেজস্ক্রিয়তা সহ্য করে নিতে আমার যে বেশ অনেকখানি সময় লেগে যাবে তা আমি জানি। কিন্তু ফাতিমার এই রূপ দেখবার আগে আমার মৃত্যু হলেই ঢের ভালো ছিলো।

আমার কোনো জবাব না পেয়ে সে আবার বললো, 'আমার কথাটা একবার শুনুন, প্লিজ।'

এবারও আমাকে পাথরের মতো নিশ্চল, নিশ্চুপ দেখতে পেয়ে ফাতিমা তার কথাগুলো বলতে শুরু করলো, 'আজকে না-হয় ভাবিদের আমরা টাকা দিয়ে সাহায্য করলাম, কিন্তু আগামীকাল? আগামী পরশু কী হবে তাদের? কার কাছে যাবে তারা? কোথায় গিয়ে হাত পাতবে?'

ফাতিমার কথাগুলো বুঝে উঠতে পারলাম না। কেবল নির্বাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমার যেন আর কিছুই বলবার নেই। ফাতিমা তার বক্তব্য থামায়নি, 'আজকে না-হয় তাদের আমরা দয়া করবো, কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের দরকার একটা আশ্রয়। মাথা গুঁজবার জন্য একটা আবাস। এই মুহূর্তে জাহিদ ভাইয়ের মেয়েটার একটা নির্ভরতার ছায়া দরকার। পরম যত্নে তার মাথায় বুলিয়ে দেবার মতন দুটো কোমল হাত দরকার। তার মাথার ওপর দরকার একটা বটবৃক্ষ।'

প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে আমি তখন বিপন্ন-প্রায়। ফাতিমার কথাগুলোর কোনো মর্মোদ্‌ঘাটন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না কোনোভাবেই। কিন্তু সে কিছু একটা বলতে চায় যা আমার বোঝা দরকার বলে মনে হচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমি বললাম, 'আমাকে একটু পরিষ্কার করে বলবে তুমি আসলে কী বলতে চাইছো?'

এবার ফাতিমা আমার হাত ধরে ফেলল। আমি খেয়াল করলাম তার চোখ দুটো রক্তজবা ফুলের মতন লাল হয়ে আছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো সে। তার এই কান্নার কারণ আমি বুঝে উঠতে পারছি না। এই ফাতিমাকে যেন আমি চিনতেই পারছি না কোনোভাবে। সে কান্না থামিয়ে বললো, 'আপনি ভাবিকে বিয়ে করুন।'

আমি আবার নির্জীব হয়ে গেলাম। তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা বাক্যটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি কি ঠিক শুনেছি? কী বললো ফাতিমা এটা? এটা সে ভাবলোই বা কীভাবে?

ফাতিমা মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। টপটপ করে তার চোখের জল নিচে গড়িয়ে পড়ছে। আমি তাকে স্পর্শ করলাম। দু-হাতে তার মুখ আলতো করে ধরে বললাম, 'তুমি ঠিক আছো তো?'

আমার প্রশ্ন শুনে আবারও তার চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুর ফোয়ারা। আমার দু-হাত ভরে উঠলো তার অশ্রুজলে। সে থরথর করে কাঁপছে। আমি শক্তভাবে

ধরলাম তাকে। আমার বাম হাত দিয়ে তার চোখের জল মুছে দিতে দিতে বললাম, 'এটা হয় না ফাতিমা।'

'কেন হবে না? আল্লাহ না করুন, জাহিদ ভাইয়ের জায়গায় আপনি আর ভাবির জায়গায় যদি আমি হতাম? আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত, অসহায় অবস্থায় ধুঁকে ধুঁকে জীবন কাটাতে আপনি দেখতে পারতেন?'

আমি যেন বোবা হয়ে গেলাম। ফাতিমার যুক্তির বিপরীতে ছোড়ার মতো যুক্তি আমার হাতে নেই। কিন্তু ও যে আবেগের আতিশয্যে একটা অসম্ভব দাবি উত্থাপন করেছে তা ওকে বোঝাতে হবে আমার। আমি বললাম, 'আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা তাদের পাশে দাঁড়াবো ফাতিমা। কিন্তু তাই বলে...।'

আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে ফাতিমা বললো, 'এটা তো দয়া করা হবে। আমি চাই না তারা দয়া নিয়ে বাঁচুক। আমি চাই তারা অধিকার নিয়ে বেঁচে থাক। একজন মহিলা তার স্বামীর অধিকার এবং একটি সন্তান তার বাবার অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকাটাই আমার কাছে অধিক পছন্দের।'

সেবার আমি আর কোনোভাবেই ফাতিমাকে বোঝাতে পারিনি। তার যুক্তির কাছে পেরে ওঠা আমার সাধ্যের বাইরে ছিলো। তারচেয়ে বড় ব্যাপার হলো—তার আত্মত্যাগের সামনে আমাকে মুখ থুবড়ে পড়তে হয়েছে। এমন পবিত্র ইচ্ছাকে অসম্মান করার মতন দুঃসাহস আমার হয়নি।

সত্যি সত্যিই আমাদের বিয়েটা হয়েছিলো। যেদিন আমার দ্বিতীয় বিয়ে হচ্ছে, সেদিন বাইরে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। আকাশে মুহুর্মুহু মেঘের গর্জন। ভারী বর্ষণে প্রকৃতি তখন একেবারে দিশেহারা। এমন ঝড়ো হাওয়ার রাতে, এমন বিপন্ন-বিপর্যস্ত সময়ে আমার বুকের মধ্যেও একটা ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলছিল। সেই রাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কান্না করেছিলো ফাতিমা। বাইরের ভারী বৃষ্টির সবটুকু জল যেন ফাতিমার চোখে এসে ভর করেছে। জাগতিক নিয়মে পুরুষ মানুষরা নাকি কঠিন প্রকৃতির হয়। তারা নাকি খুব সহজে কাঁদতে পারে না। জগতের নিয়মকে ভুল প্রমাণিত করে সেদিন ফাতিমাকে জড়িয়ে ধরে আমিও খুব কেঁদেছিলাম।

জীবনের রকমফের

[এক]

বাসের হেল্পার ভাড়া বললো পঁচিশ টাকা। প্রতিদিনের নির্ধারিত যা ভাড়া, তার চাইতে পাঁচ টাকা বেশি দাবি করায় রক্ত যেন মাথায় চড়ে বসল। দেশটা কি তাহলে মগের মুল্লুকে পরিণত হলো? যার যা মন চাইবে আদায় করবে?

আমার মধ্যবিত্ত মনের ক্রোধ মনের ভেতরেই গোঙাতে লাগলো, বাইরে তা যে দ্বিগুণ প্রলয়ে আছড়ে পড়বে সেই সাহস আর শক্তি আমাদের কোথায়? তবুও, কিছু অন্তত বলতে হয়, তা না হলে মধ্যবিত্ত জীবনের ষোলোকলাটাও আবার অপূর্ণ থেকে যায় অনেক সময়।

চেহারায় পরিমিত ক্ষোভ আর বিরক্তির রেশ টেনে এনে বললাম, 'পঁচিশ টাকা মানে? বিশ টাকা দিয়ে প্রতিদিন যাওয়া-আসা করি। পঁচিশ টাকা দেবো কেন?'

খেয়াল করলাম, আমার ক্ষোভ নিয়ে হেল্পারের মাঝে কোনো তাড়না নেই। আমাকে ফুঁসতে দেখে সে যে ভয়ে এতোটুকুন হয়ে যাবে, নিদেনপক্ষে ভাড়া বাড়ানোর ব্যাপারে কাঁচুমাচু করে বিনীত গলায় তার যুক্তি পেশ করবে—এমন কোনো লক্ষণও তার মাঝে দেখা গেলো না। তার অপরিবর্তিত, কিন্তু বিরক্তি-মিশ্রিত চেহারা যেন আমাকেই শাসানোর প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত। অবশ্য, তার কাছ থেকে এতোটুকুন আশা করাটাও নেহাত বোকামি বৈ কিছু নয়। দম্ভের দায়ভার মেটাতে আমি যদি তার গাড়ি থেকে নেমেও পড়ি, তাতে তার বিশেষ কোনো ক্ষতি নেই। আমার

শূন্যতা পূরণের জন্যে বাইরে একঝাঁক উৎসুক যাত্রী অজগরের মতন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। নেমে গেলেই মুহূর্তে পূরণ হয়ে যাবে আমার শূন্যস্থান। না গেলে বরং ক্ষতিটা আমারই। অতো দূরের পথ; কখন যে আবার নতুন বাস আসবে তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। সুতরাং, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাসায় ফিরতে হলে বাড়তি টাকা না গুনে উপায় নেই কোনো।

হেল্পারের কর্কশ কিন্তু পরিচিত চিৎকারে সংবিৎ ফিরে পেলাম। আমার ভাবনার সুরে ছেদ ঘটিয়ে সে তার বাজখাঁই গলায় বলে উঠলো, 'পঁচিশ টাকাই ভাড়া। টাকা না থাকলে নাইমা যান। আপনারে কেউ ধইরা রাহে নাই।'

হেল্পারের কথাই সত্য। কেউ আমাকে জোর করে তার গাড়িতে চাপিয়ে দেয়নি। 'পাছে নেমে যাই' ভেবে কোনো আহত নয়নও সবিশেষ তাড়না নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে নেই। এই যে বিশ টাকা থেকে লাফ দিয়ে পঁচিশ টাকা ভাড়া গুনতে হচ্ছে, আমি ব্যতীত তা নিয়ে আর কারও মাঝে কোনো হাপিত্যেশ, কোনো মাথাব্যথাই দেখা গেলো না। একটা মানুষ পর্যন্ত টুঁ শব্দটাও করলো না। দুর্মূল্যের বাজারে অন্যায় আর অনিয়ম মানুষের গা সয়ে গেছে, না তাদের বোধশক্তি লোপ পেয়েছে তা বুঝে ওঠা মুশকিল। অগত্যা পঁচিশ টাকা ভাড়া গুনেই আমাকে ফিরতে হলো।

বাসায় ফিরেছি; রোজকার মতো—কাঁধে ব্যাগ, চোখে চশমা আর শরীরভরা একরাশ ক্লান্তি নিয়ে। আমাকে দরজা খুলে দেয় আমার স্ত্রী, রেবেকা। দরজা খুলেই নিত্যদিনকার অভ্যাসমতো সালাম দিয়ে একপাশে আড়াল হয়ে দাঁড়ায় সে। আমি ক্লান্ত ভীষণ। হনহন করে হেঁটে চলে আসি নিজেদের রুমে। রেবেকা এসে আমার কাছে দাঁড়ায়। শশব্যস্ত হয়ে বলে, 'তোমাকে লেবুর শরবত করে দিই?'

ক্লান্তিতে আমার গা নুইয়ে আসে। শরীরটা যেন বিছানা ছোঁয়ার যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ঘরে এলে আমার বাকশক্তি লোপ পায়; দরকারি কথাটুকু বলতেও কেমন অনীহা আর অসহ্য লাগে। রেবেকা আবার প্রশ্ন করে, 'মাথাব্যথা করছে? রং চা করে দিই? লেবু আর আদা দিয়ে?'

আমি রং চায়ের ব্যাপারেই সম্মতি জ্ঞাপন করি। আদিকার রাজারা যেভাবে হুকুম তলব করতো, ঠিক সেরকম—একটা অস্পষ্ট ইশারায়। রেবেকা ভোঁ-দৌড়ে রান্নাঘরে ছুটে যায়। তড়িঘড়ি করে চুলোয় বসিয়ে দেয় পানি। একফাঁকে কেটে নেয় এক ফালি লেবু আর খানিকটা আদা। মুহূর্তকাল পরেই সে ধোঁয়া ওঠা কাপ হাতে আমার

সামনে এসে দাঁড়াল। চায়ের কাপ যে-ই না মুখে নিতে যাবো, ওমনি বিকট শব্দে কেঁদে ওঠে আমার ছেলে, আব্দুল্লাহ। কান্নার সে কী আওয়াজ! কানের পর্দা যেন ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো।

আমার সামনে থেকে একেবারে হাওয়ার মতোই অদৃশ্য হয়ে গেলো রেবেকা। যে রুমে আব্দুল্লাহ শুয়ে আছে, সেখানে চোখের পলকে উপস্থিত হয়ে প্রয়োগ করতে লাগলো বাচ্চার কান্না থামানোর আদিম মেয়েলি কৌশল। মেয়েদের ঝুলিতে যে ক'প্রকারের সান্ত্বনা-বাক্য বাচ্চাদের জন্য মজুদ থাকে, তার সব ক'টাই রেবেকা একে একে আব্দুল্লাহর সামনে মেলে ধরতে লাগলো। কিন্তু আব্দুল্লাহও ছেড়ে কথা বলবার পাত্র নয়। এমন মন-ভোলানো মন্ত্রে সম্ভবত তার আর রুচি নেই। রেবেকার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আব্দুল্লাহও সমান উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে কান্না অব্যাহত রাখলো।

আব্দুল্লাহর কান্নার আওয়াজে আমার যে বেশ অসুবিধে হচ্ছে সেটা রেবেকা বোঝে। আর বোঝে বলেই সেও হতোদ্যম হয়ে যায়নি। রেবেকা একসুরে আব্দুল্লাহকে শান্ত করবার চেষ্টা চালিয়ে গেলো, 'ও বাবা আমার! আমার সোনা আব্বুটা! আর কান্না করে না। এই দেখো, আম্মু তোমাকে কোলে নিয়েছি বাবাই। আর কান্না করে না আমার বাবুটা। ওলে ওলে বাবা আমার!'

আব্দুল্লাহর কান্না আর রেবেকার কান্না থামানোর সংগীত—দুটোর যৌথ প্রযোজনা আমার মাথাব্যথাটা যেন আরও দ্বিগুণ বাড়িয়েই দিলো।

শরীর একটু হালকা লাগলে ফোন হাতে নিয়ে, দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে প্রবেশ করি নীল-শাদার ভার্চুয়াল জগতে। জগৎটা অদ্ভুত মায়াময়! উত্তর-আধুনিক সময়ে, আমাদের সকল সুখ-দুঃখের গল্প এই জগতের বাসিন্দারা কীভাবে যেন জানতে পেরে যায়। যান্ত্রিকতার মোহে কিংবা আধুনিকতার লোভে আমরা আমাদের সকল সম্পর্কের গল্প, সকল অর্জন আর ব্যর্থতার ফিরিস্তি এখানে না বলে শান্তি পাই না। একসময় আমরা ছিলাম সামাজিক জীব। কিন্তু সে যুগের অবসান ঘটেছে বেশ আগেই। আমরা প্রবেশ করেছি পৃথিবীর মেরুকরণের এমন এক মোহময় সময়ে, যেখানে আমরা হয়ে বসে আছি ভার্চুয়াল বাসিন্দা। আমাদের এখানেই ঘোর, এখানেই ভালো লাগা।

প্রতিদিন রাতের এই অংশটায় আমার কাজ খুবই সুনির্দিষ্ট—ফেইসবুক স্ক্রল করা। সারাদিনের জমানো সংবাদ, খেলাধুলার যাবতীয় আপডেট, বন্ধুদের হাসিখুশি মুখচ্ছবি দেখতে দেখতে কখন যে সময় বয়ে যায়, টের পাওয়া যায় না। আজও তা-ই করছি। ফেইসবুকের গভীর থেকে গভীরে গিয়ে তুলে আনছি মিস হয়ে যাওয়া ঘটনাগুলোকে, সময়ের সংগতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখছি দুর্দান্তভাবে; কে জানে, আগামীকাল অফিসে গিয়ে যদি দেখা যায় আজকের কোনো ঘটনা নিয়ে খুব শোরগোল পড়ে গেছে, কিন্তু তার বিন্দুবিসর্গও আমার জানা নেই, তখন আমার নাকউঁচু কলিগেরা আমার দিকে কী অদ্ভুতভাবেই-না তাকাবে! সূর্যের নিকটতম গ্রহ বৃহস্পতিতে প্রাণের সন্ধান মিলবার সংবাদেও তারা এতোখানি চমকাবে না যতখানি চমকাবে আমাকে দেখে। বিস্ময় ধরে রাখতে না পেরে কেউ কেউ বলেও বসতে পারে, 'একটা ঘটনা ঘটার চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেলো, আর আপনি তার কিছুই জানেন না? কোন দুনিয়ায় বাস করেন আপনি?'

আমি যে পৃথিবী নামক গ্রহেই বাস করি এবং দুনিয়ার সাথে আমারও যে রয়েছে ভালো যোগসাজশ, অন্তত তার স্বাক্ষর রাখতে হলেও আমাদের এখন ভার্চুয়ালমুখী হতে হয়।

ইতোমধ্যেই আব্দুল্লাহ আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। খেয়াল করলাম, রেবেকা খুব সযত্নে আব্দুল্লাহকে শুইয়ে দিয়ে গেলো আমার পাশে। তার ছোট্ট মশারিটাও টাঙিয়ে দেওয়া হলো। আব্দুল্লাহকে শুইয়ে দেওয়ার পর রেবেকা খুব নিচু স্বরে, পাছে আব্দুল্লাহ জেগে যায় এই ভয়ে, জিগ্যেশ করলো, 'খাবার কি এখনই দেবো?'

একেবারে শুরুর ক্লান্তিটা যখন আর নেই, তখন কথা একটু বলাই যায়। রেবেকার প্রশ্নের জবাবে তাই বললাম, 'একটু পরেই দাও।'

একটু পরে দেওয়ার কথা শুনে রেবেকা আবার রান্নাঘরে ছুটে গেলো। সেই কবেই সে রান্না চড়িয়েছিল কে জানে। ঠান্ডায় সবকিছু জমে বরফ হয়ে আছে নিশ্চয়। খাবারগুলো এবার গরম করবার পালা। সে খুব সযত্নে তার কাজে গেলো। তার কাজ, যা সে প্রত্যহ করে। রুটিন মেনে। যাতে কোনোদিন ব্যত্যয় ঘটে না।

একটু পরে সে আবার ছুটে এলো আমার কাছে। শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বললো, 'চিংড়ির ঝোল আর গরুর গোশত দুটোই করা আছে। দুটোই গরম করবো?'

আমি তন্ময় হয়ে ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছি। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা লেখা চোখের সামনে এখন। আমার এক বন্ধু, যার সাথে ফেইসবুকেই আমার পরিচয়, তার লেখা। তাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে আজ। ডিভোর্স-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সে খুব আবেগময় করে তুলে ধরেছে। প্রচণ্ড ভালোবাসতো একজন অন্যজনকে। এরপর, কী থেকে যে কী হলো—ডিভোর্স! খুব কষ্টই লাগলো। তাদের দুজনের জন্যই।

রেবেকা আবার বললো, 'শুনছো? তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি।'

আমি মাথা তুলে রেবেকার দিকে তাকালাম। বললাম, 'কী?'

'চিংড়ি আর গোশত দুটোই করা আছে। দুটোই গরম করবো কি না জানতে চেয়েছি। নাকি দুটোর যেকোনো একটা?'

বেশ রাগ উঠলো। এটা কোনো প্রশ্ন হলো করার মতো! গলা উঁচু করে, একটু জোর শব্দেই বললাম, 'যেকোনো একটা করলেই তো পারো। এটা জিগ্যেশ করার জন্য তো কাকতাড়ুয়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না।'

রেবেকা চুপ করে থাকলো কিছুক্ষণ। এরই ফাঁকে আমি আগের সেই লেখায় পুনরায় মনোনিবেশ করেছি। সেই লেখায়, যেখানে আমার বন্ধু তুলে ধরেছে একটা সংসার ভাঙার কাহিনি। এতোদিনের গোছানো একটা সংসার কীভাবে ভেঙে গেলো সেই মর্মান্তিক দৃশ্যপট থেকে নিজের চোখদুটো সরানো দায় হয়ে পড়েছে। খানিক বাদে রেবেকা আবার বললো, 'সেদিন তুমি চিংড়ির ঝোল খেতে চেয়েছিলে। আমার জ্বর থাকায় রান্না করা হয়নি। তাহলে চিংড়িটাই গরম করি?'

রেবেকার কথাগুলো আমার মনোযোগে বেশ বিঘ্ন ঘটালো। সারাদিন কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতে হয়। বাসায় ফিরে যে একটু আরাম-আয়েশ করবো, নিজের মতো করে খানিকটা সময় পার করবো তার জো নেই। জেরার পর জেরা চলতেই থাকে। আমিও তো মানুষ, কোনো যন্ত্র তো নই। মানুষ হিশেবে আমারও তো কিছু নিজস্ব সময় চাই। কিছু সময়, যা একান্তভাবেই কেবল আমার।

মুখে বিরক্তির সর্বশেষ রেখাটি ফুটিয়ে তুলে বললাম, 'জানোই যখন আমি চিংড়ির ঝোল খেতে চেয়েছি, সেটা তাহলে বারে বারে জিগ্যেশ করছো কেন? চিংড়িটাই গরম করে নিলে পারো।'

আমার বিরক্তিভরা উত্তরে রেবেকা এবার সত্যি সত্যিই দমে গেলো। ধীরপায়ে সে পা বাড়াল রান্নাঘরের দিকে। দরজার যে জায়গায়টায় রেবেকা এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো, সেখানে এখন একটা পর্দা দুলছে। রেবেকার প্রস্থানে শূন্যে তৈরি হওয়া হাওয়ায়। আর আমি? আমি আবারও ডুব দিয়েছি নীল-শাদার সেই বায়বীয় জগতে।

খাওয়া-দাওয়া পর্বের একেবারে মাঝামাঝি পর্যায়, আবারও আব্দুল্লাহর সেই গগনবিদারী চিৎকার। সেই কান ফাটানো কান্নার আওয়াজ। আমার তাতে কোনো অসুবিধা হয় না অবশ্য। বেশ খেতে হয়েছে চিংড়ির ঝোলটা। আমি আরাম করে খাচ্ছি। আর রেবেকা? আব্দুল্লাহর কান্নার শব্দ শুনে সে কোন ফাঁকে যে হাওয়ায় উড়ে আব্দুল্লাহর কাছে চলে গেলো, আমি টেরই পেলাম না। আবারও সেই একই সুর। একই সংগীত। 'ও বাবা আমার! আমার সোনা আব্বুটা! আর কান্না করে না। এই দেখো, আম্মু তোমাকে কোলে নিয়েছি বাবাই। আর কান্না করে না আমার বাবুটা। ওলে ওলে বাবা আমার!'

সকাল হয়। আমি অফিসের জন্য বের হই। আমার যা যা দরকার, সবকিছুই হাতের কাছে পাওয়া যায়। রেবেকাই এনে রাখে। প্রতিদিন। নিয়ম করে। আজও তার ব্যত্যয় হয়নি। সে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। ততোক্ষণ, যতোক্ষণ আমি তার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য না হই। এটাই হলো রোজকার জীবন। আমার...আমাদের।

[দুই]

আজ রেবেকা বাপের বাড়ি যাচ্ছে। আমার শ্বশুর এসেছেন তাকে নিয়ে যেতে। কাজের ভীষণ চাপ; রেবেকাকে রেখে আসার কোনো ফুরসত আমার হাতে নেই। কদাচিৎ থাকে, সব সময় নয়। ঠিক এগারোটা ত্রিশ মিনিটে তারা চলে গেলো। আমি অবশ্য এর আগেই অফিসে চলে এসেছি। সকালবেলা রেবেকা বলছিল, 'কবে যাবে আমাদের ওখানে?'

আমি শার্টের হাতা গুটাতে গুটাতে বললাম, 'বলতে পারছি না। কাজের চাপ আছে।'

আমার উদাসীন উত্তরে রেবেকার চেহারা গুমোট অন্ধকারে ছেয়ে গেলো। বাড়তি কোনো প্রশ্ন করে নিজের খারাপ লাগাটাকে বাড়ানোর পথে না গিয়ে সে বললো, 'ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া কোরো। বাইরের খাবার খেয়ো না যেন! ক্যান্টিনে খেতে

পারো। অন্তত বাইরের চেয়ে ভালো।'

'তা বটে।'

'বেশি রাত জেগো না। রাত জাগলে তোমার চোখের নিচে কালচে দাগ পড়ে।'

'হুম।'

'বাবা বলছেন মায়ের অবস্থা খুব বেশি ভালো নয়। বেশ অনেকদিন থাকা লাগতে পারে।'

'সমস্যা নেই।'

'তোমাকে আরেকটা ডিম অমলেট করে দিই?'

'দরকার নেই।'

ওপরের কথাগুলোই রেবেকার সাথে আমার আজকের শেষ সংলাপ। এরপর আমি অফিসের জন্য বেরোই। ঠিক এগারোটা ত্রিশ মিনিটে, রেবেকা মেসেজ করেছে আমার ফোনে। লিখেছে, 'আমরা এইমাত্র বেরোলাম। তোমার অপেক্ষায় থাকব।'

[তিন]

বাসায় ফিরেছি রোজকার মতো। কলিংবেল চেপে দাঁড়িয়ে আছি বাইরে। রেবেকার কোনো সাড়াশব্দ নেই। ও, মনে পড়েছে। ও তো আজ বাসায় নেই। আজিব! দরজার সাথে এতোবড়ো একটা তালা ঝুলছে সেটাও আমার চোখে পড়লো না! রেবেকার ওপর কী এক অভ্যস্ততা তৈরি হয়ে গেলো আমার! ব্যাগ হাতড়িয়ে বাসার চাবি বের করলাম। দরজা খুলে ভেতরে আসতেই মনে হলো ঘরজুড়ে এক নিশ্চুপ নীরবতা। সুনসান। বাতিগুলো জ্বালাতেই চোখ গিয়ে পড়লো রেবেকার পড়ার টেবিলে। একটা খাতা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে সেখানে। কৌতূহল জাগার কথা নয়। এমন নিতান্ত সাধারণ বিষয়ে আমার কোনোদিন কোনো আগ্রহ জন্মেনি। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা সাধারণ হলেও আচমকা। খুবই গোছালো ধরনের মেয়ে রেবেকা। আনমনে এই খাতাটাকে এভাবে সে রেখে চলে যাবে তা অন্তত আমার মনে হয় না।

খাতাটা হাতে নিতেই আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠলো যেন অসংখ্য শব্দমালা। রেবেকার হাতের লেখা; কিন্তু কী লেখা এতে?

আমি জানি জীবিকার তাগিদে তোমাকে ছুটতে হয়। ভীষণ ব্যস্ততায় পার হয় তোমার সারাটা দিনমান। একমাথা যন্ত্রণা নিয়ে তুমি বাসায় ফেরো রোজ। তোমার মুখাবয়ব দেখলেই আমি আঁচ করতে পারি তোমার কর্মময় জীবনের ক্লান্তি। তোমার ক্লান্তি আমাকে পীড়া দেয়; তোমার সামান্য অসুবিধেও আমাকে যন্ত্রণায় কাতর করে ফেলে। তুমি অফিস থেকে ফিরলেই আমি শশব্যস্ত হয়ে পড়ি তোমাকে সামলাতে। তুমি কি কফি খাবে না শরবত, সেই চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে যাই। তোমার রাতের খাবার, শোবার বিছানা, সকালের নাস্তা, অফিসের পোশাক—সবকিছু ঘিরেই আমার পৃথিবী। আমি ব্যস্ত থাকতে চাই তোমাকে নিয়ে।

আচ্ছা, অফিস থেকে ফিরে কখনো কি তুমি জানতে চেয়েছো আমি দুপুরে খেয়েছি কি না? তুমি জানো আমি সাজতে পছন্দ করি। ঠিক কতোদিন হয় সেজেগুজে তোমার সামনে দাঁড়াইনি, মনে করতে পারো? কখনো নিজ থেকে জানতে চেয়েছো কেন আমি আগের মতো সাজার ফুরসত পাই না? অফিস থেকে যে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে তুমি আসো, সেই চেহারা আমাকে হতবিহ্বল করে দেয়। তোমার পরিশ্রান্ত অবয়বের অবসাদ আমি বুঝতে পারি। আচ্ছা, তুমি কি কখনো আমার বিধ্বস্ততা বোঝার চেষ্টা করেছিলে? অন্তত একবার? সংসারের ঘানি টেনে আমারও যে মাঝে মাঝে ক্লান্ত লাগে, সেটা তুমি অনুভব করেছো কখনো?

সারাটা দিন একা একা থাকি। একটা অবুঝ বাচ্চাকে সামলাই। তার সাথে আর কতই বা কথা বলা যায়, বলো? মন চায় খুব করে কথা বলতে কিংবা খুব মন দিয়ে কথা শুনতে। অপেক্ষায় থাকি কখন তুমি ফিরবে আর আমি মেলে বসবো আমার গল্পের ডালপালা। তুমি তন্ময় হয়ে শুনবে আমার কথা। আর যখন তুমি বলা শুরু করবে, আমি কেবল মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনে যাবো। কিন্তু দেখো, তুমি ঠিকই তন্ময় হয়ে থাকো। কিন্তু তোমার সেই বিস্ময়, সেই আবেগ, সেই বিহ্বলতা জুড়ে কেবল আমিই নেই। আছে অন্য অনেকে। বাসায় এসে তুমি সেই ভার্চুয়ালে ডুব দাও, আমার কথা তোমার খেয়ালই থাকে না। তুমি যেখানে আমগ্ন ডুবে থাকো, সেখানে কেউ কি তোমার জন্য দরজা ধরে অপেক্ষা করে? তোমার পছন্দের খাবার প্রস্তুত করে অধীর অপেক্ষার প্রহর গোনে তোমার জন্য? কিন্তু দেখো, যে মানুষটা তোমার পথ চেয়ে বসে থাকে সারাদিন, তার জন্য তোমার এতোটুকুও সময় হয় না।

তুমি সারাদিন ব্যস্ত থাকো, তাই তোমাকে অকারণ প্রশ্ন করলে রেগে ওঠো। কিন্তু, তোমার ছেলে, যাকে আমার অস্তিত্বে ধারণ করে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছি, সে

যে আমাকে প্রতিদিন কতো সহস্র হাজার প্রশ্ন করে তা তুমি ভাবতেও পারো না। কিন্তু তার প্রশ্নের প্রতি কোনোদিন সামান্য রাগ, সামান্য উদাসীনতা আমি দেখাইনি; বরং মুখে একরাশ হাসি আর ভালোবাসা মিশিয়ে তার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই। ভালোবাসার বাঁধনটা তো এমনই, বলো?

আব্দুল্লাহকে ঘিরে সারাদিন আমার যে ব্যস্ততা, সেই ব্যস্ততা কখনোই কি তোমার চোখে পড়ে? কখনো কি তুমি আমার সেই ব্যস্ততার মূল্যায়ন করেছিলে? তুমি কেবল দেখছো তোমার ছেলেটা দিন দিন বড় হয়ে উঠছে। এটা শিখছে, ওটা শিখছে। কিন্তু তার পেছনে আমার যে বিনিয়োগ, সেই বিনিয়োগ কখনোই কি তোমার চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়েছে?

বিশ্বাস করো, আমারও একটা আলাদা পৃথিবী আছে। আমার সেই আলাদা পৃথিবীজুড়ে কেবল তুমি আর তুমি। তুমিই আমার সেই জীবনের রং। তোমার অবসরের সমস্তটা জুড়ে আমি থাকতে চাই। সারাদিনের ব্যস্ততা শেষে, তুমি এসে আমার সাথে খোশগল্পে মেতে উঠবে, এমন স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমি রোজ ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু স্বপ্নটা আমার চোখের পাতায় রয়ে যায়। তুমি তোমার মতোই। তুমি আসো। ডুবে যাও একটা নীল-শাদার জগতে। খাও। এরপর ঘুম। আমার জন্য তোমার কি একটু সময় থাকতে নেই? অন্তত একটু ফুরসত?

[চার]

পকেট হাতড়ে মোবাইল বের করলাম। অবিশ্বাস্য! ডায়াল লিস্টের কোথাও রেবেকার নাম্বার নেই। এই এতোদিন পার হয়ে গেলো সে আমার ঘরে নেই, অথচ এতোদিনে একটাবার আমি তাকে ফোন দিইনি? কতোদিন হয় তার জন্য কিনে আনি না বেলি ফুলের মালা। সত্যিই তো, কতোদিন হয় তাকে আমি সাজতে দেখি না। আব্দুল্লাহর জন্মের পর তার শরীরটাও ভেঙে গেছে। ছেলেটাকে সামলাতে গিয়ে বেচারি নিজের যত্নের কথাটুকুও ভুলে বসে আছে। তবে সে ভোলে না আমাকে। আমাকে ঘিরেই তার অঢেল ব্যস্ততা। আর আমার ব্যস্ততা? অফিস...ফেইসবুক...অফিস...

[পাঁচ]

এপাশ-ওপাশ দুলুনি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে আমাদের ট্রেন। আমি ছুটে যাচ্ছি রেবেকার কাছে। আমার হাতে ফুলের তোড়া। বেলি আর কাঠগোলাপ ফুলের

সমন্বয়ে বানানো। বেলি ফুল রেবেকার পছন্দ, আর কাঠগোলাপ আমার। তার মাঝখানে একটা চিরকুট। তাতে লেখা—'I Love You'...

হিজল বনের গান

একটা জানলা। আকাশে একফালি চাঁদ। চাঁদের রুপোলি জোছনা জানলা গলে ভেতরে ঢুকে পড়ছে। খানিকটা দূরেই একটা পুকুর। পুকুরের পাড়ে দুটো হিজল গাছ। হিজলের গায়ে কিছু গুল্ম, আর তার নিচে একটা কবর। আমার মায়ের।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে, অপলক দৃষ্টিতে আমি তাকিয়ে আছি আমার মায়ের কবরটার দিকে। কবরের উঁচু ঢিপিটা যেন আমার বুকের ওপর বসে থাকা কোনো জগদ্দল পাথর। মনে হলো—হিজলের গাছ দুটোর মন খারাপ; আমার মতো। আমার বুকের ভেতর যে কালবোশেখি ঝড় বইছে, যে অমাবশ্যা আজ আমার হৃদয়াকাশে, তা হয়তো বা হিজলের গাছ দুটোর মনেও সমানতালে ঝড় তুলেছে। আমার মতোন, তাদেরও যে ভারি আদরে বড় করেছিলো আমার মা। মামাবাড়ি থেকে, আমাদের সেই বাড়ন্ত শৈশবের সময়ে মা দুটো হিজল চারা এনে লাগিয়েছিলেন এখানটায়। বাবা বলেছিলেন, 'এই গাছ কেউ শখ করে লাগায়?' মা বললো, 'কেউ লাগায় না বলেই তো আমি লাগালাম।' বাবা চুপ হয়ে গেলেন। হিজল চারা নিয়ে আর কোনোদিন মাকে কোনো প্রশ্ন করেননি। সেই হিজল চারার গাছ আজ শাখা-পল্লবে আকাশ ছুঁয়েছে। কিন্তু মাটির চারাতে প্রথম যে স্বপ্ন বুনেছিল, সেই স্বপনচারিণী আজ অতীত।

আমার মনে পড়ে, পৌষের হাড়-কাঁপানো শীতে মা আমার পড়ার টেবিলের পাশে চুলো থেকে তুলে আনা কড়কড়ে কয়লা-আগুন নিয়ে বসে থাকত। ছেলের পরীক্ষা, রাত জেগে পড়তে হবে, শীত যদি ছেলেকে কাঁবু করে ফেলে অথবা ঠান্ডায় পড়াশোনা করতে গিয়ে ছেলে যদি নিউমোনিয়া বাধিয়ে বসে—এই ছিলো মায়ের

ভয়। আমি পড়ি আর মা খানিক বাদে বাদে আগুন নেড়ে দেয়। একটা উষ্ণতা আমার গায়ে এসে ভর করে।

গ্রীষ্মে দিনের বেলা রোদের প্রখরতা, আর রাতজুড়ে তার হাপিত্যেশ। কিন্তু জননী আমার, ঠিক আগের মতোই, পুরোনো এক পাখা হাতে নিয়ে, আমার টেবিলের পাশে বসে অবিরাম অবিরত হাত চালাতো। যেন তার কোনো ক্লান্তি নেই।

একবার বৃষ্টিতে ভিজে ভীষণ অসুখ বাধিয়েছিলাম। দিন যায় রাত আসে, চোখ মেলে আমি তাকাতে পারি না। শুনেছিলাম, মা সারাটা দিন আমার মাথার কাছে বসে থাকত। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। বাঁধভাঙা চোখের জল যেন নদী হতে চায়। পাশের বাড়ির মোতালেবের তালে পড়ে বৃষ্টিতে ভিজেছি বলে জীবনে আর কোনোদিন ও'পাড়ায় মা আমাকে পা ফেলতে দিলো না। আমাকে নিয়ে তার ছিলো সীমাহীন ভয়। বুকের মানিকের যদি কিছু হয়ে যায়?

রুপোর থালার মতো আকাশে ঝকঝকে চাঁদ। জোছনায় উঠোন মাখামাখি। অল্প এগুলেই একটা আদিম পুকুর। তার পাড়ে দুটো হিজলের গাছ; তাদের গা আঁকড়ে ধরে কিছু গুল্ম। ঠিক তার নিচেই একটা কবর যেখানে শুয়ে আছে আমার পরম মমতাময়ী মা।

চাঁদের আলোতে আমি দেখতে পাচ্ছি, হিজলের গাছ দুটো দুলছে। বাতাসে কোথাও গুঞ্জন উঠেছে একটা সুরের। আমি শুনতে পাচ্ছি, আমার বুকের গহিন থেকে, আমার অন্তরাত্মা ভেদ করে একটা অপার্থিব সুর ভেসে আসছে। রাব্বির হাম-হুমা কামা রাব্বা-ইয়ানি সগীরা! একটা গান। হিজল বনের গান।

বিশ্বাস

[এক]

দূরের দিগন্তে, যেখানে একটু আগে সূর্যের শেষ রক্তিম আভাটুকু মিলিয়ে গেছে, সেখানে এখন ভর করেছে অঘোর অন্ধকার। আর সেই অন্ধকার কেটে কেটে, মাথায় পাটের বোঝা নিয়ে লোকালয়ে ফেরত আসছে দুটো ছায়ামূর্তি। নাজিমুদ্দিন এবং তার ছেলে মতি। বয়সের তুলনায় মতির শরীরের বাড়ন চোখে পড়ার মতো। চাষাভুষার ছেলে, প্রকৃতির নির্মল আলো-বাতাস খেয়েদেয়ে বড় হয়। মাটি আর জলের সংস্পর্শ পেয়ে এরা যেন পতিত জমির মাঝে আগাছার মতো তরতর করে বেড়ে ওঠে।

মতি নাজিমুদ্দিনের আগে আগে হাঁটছে। চারপাশের প্রকৃতির মতো তারাও চুপচাপ, শান্ত। একটু পরে কথা শুরু করে দেয় মতি। 'জানো বাজান, আমাগো ইশকুলে নতুন যে হেডমাস্টার আইছেন, উনি কইছেন আমি নাকি বিরিত্তি পাইবার পারি।'

নাজিমুদ্দিন ক্লান্ত, কিন্তু কোমল গলায় জানতে চাইলো, 'এইটা আবার কী জিনিস, বাজান?'

'একটা পরীক্ষা হয় বাজান। ইশকুলের যেই পোলা-মাইয়ারা পড়ালেহায় ভালো, তারা এই পরীক্ষা দেয়। তাগো মইধ্যে থেইকা যারা বেশি ভালো পরীক্ষা দিবার পারে, তাগোরে সরকার পুরস্কার দেয়। ম্যালা ট্যাহা দেয়।'

'সইত্য?', ক্লান্ত চোখে বিস্ময় জাগে নাজিমুদ্দিনের। তার ছেলে এই বয়সে টাকা পাবে, তাও আবার পড়ালেখা করে—তা যেন অবিশ্বাস্য ঠেকে তার কাছে।

'হ বাজান। আমাগো নতুন হেডমাস্টার তো এমনডাই কইছে।'

'হেডমাস্টরে কইছে তুই এই পুরস্কার পাইবি?'

'হ, কইছে ভালা কইরা পইড়তে। আরও মন দিয়ে পইড়লে আমি নাকি এই পুরস্কার পাইবার পারি।'

চোখমুখ ঝলমল করে ওঠে নাজিমুদ্দিনের। সন্তানের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কাছে, চোখের সামনে থাকা ঘুটঘুটে অন্ধকারকে তার বিভ্রম বলে মনে হয়। কিন্তু, পরক্ষণেই আজমল ব্যাপারীর কথা মনে পড়লে নাজিমুদ্দিনের স্বপ্নভঙ্গ হয়। বেপারীর কাছে তার সমস্ত ভিটেমাটি বন্ধক দেওয়া। চড়া সুদের ঋণ শোধ করা না গেলে নাজিমুদ্দিনকে সংসার পাততে হবে খোলা আকাশের নিচে। সন্তানের কাঁধে ভর করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন নাজিমুদ্দিনের চোখের তারায় ভেসে উঠেছিল—বেপারীর কথা মনে পড়ায় তা যেন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। আবার ক্লান্তি ভর করে নাজিমুদ্দিনের শরীরে। মাত্র এক ক্রোশের পথ, কিন্তু তার কাছে মনে হয়—অনন্তকাল ধরে সে এই পথে হাঁটছে। এই পথ যেন কোনোভাবে ফুরোবার নয়।

দুজনের মাঝে আবারও নীরবতা ভর করে; কিন্তু থামে না নির্জনতার গায়ে ভর করে পথ পাড়ি দেওয়ার তাদের সেই আবহমানকালের যাত্রা। এভাবেই কেটে যায় তাদের জীবন। জীবিকার অন্বেষণে কতো স্বপ্নকে তারা পায়ে মাড়িয়ে যায় এই দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠে, কতো স্বপ্ন যে কর্দমাক্ত মাটির সাথে লেপ্টে যায়—মহাকাল তার সাক্ষী।

হঠাৎ অন্ধকারের বুক চিরে জ্বলে ওঠে একটা ছোট্ট আলোর রেখা। খানিক দূরে, কেউ যেন একটি ছোট্ট পিদিম হাতে এগিয়ে আসছে এদিকে। আলোটা কাঁপছে। এই সময়ে এদিকটায় কারও আসবার কথা নয়। নাজিমুদ্দিন থমকে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে পড়ে মতিও। আগত আগন্তুককে দেখার আশায় বিলের একপাশটায় তারা অপেক্ষা করে।

অনেকক্ষণ পরে একটা ছায়ামূর্তি চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। আরও কাছাকাছি আসার পরে তারা আবিষ্কার করে আগন্তুককে। পাশের গ্রামের রাসুর মা।

পঞ্চাশোর্ধ এই মহিলাকে সন্ধ্যার এমন ঘোর অন্ধকারে দেখতে পেয়ে নাজিমুদ্দিন বেশ অবাক হয়। নাজিমুদ্দিনের বিস্ময়ের রেশ কাটবার আগেই রাসুর মা বলতে শুরু করে, 'নাজিমুদ্দিন না?'

'হ বুজান।', নাজিমুদ্দিনের ত্বরিত উত্তর। 'এই রাইতের বেলা, একলা কই থেইকা আইতাছো গো বু?'

রাসুর মা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে দিতে তার শরীর ক্লান্ত। হাতে থাকা জ্বলন্ত পিদিম মাটিতে রেখে আইলের ওপর বসে পড়লো রাসুর মা। হাত দিয়ে ইশারা করে নাজিমুদ্দিনকেও বসতে বললো। রাসুর মায়ের ইশারা পেয়ে মাথা থেকে পাটের বোঝা দুটো আইলে রেখে বসে পড়লো নাজিমুদ্দিন এবং মতি।

'আরে শোনো নাজিমুদ্দিন, দুনিয়ার খবর কোনোকিছু রাহো?'

বিস্ময়ের রেশ যেন আরও বেড়ে যায় নাজিমুদ্দিনের। কৌতূহলী গলায় জানতে চাইলো নাজিমুদ্দিন, 'কিছু হইছেনি বু?'

'হইছে মানে? আমাগো কপাল খুইল্লা গেছে গা।'

নাজিমুদ্দিনেরা হাভাতে মানুষ। কপাল খোলার গল্প শুনলে তাদের আগ্রহ এবং আবেগ—দুটোই হড়বড় করে জেগে ওঠে। রাসুর মায়ের পিদিমের আলো হোক কিংবা কপাল খুলতে যাওয়ার আনন্দ এবং আগ্রহের উচ্ছ্বাস—কোনো এক বিচিত্র কারণে নাজিমুদ্দিনের চেহারা থেকে সমস্ত অন্ধকার যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। মাটিতে হাত-পা ছেড়ে বসে পড়লো নাজিমুদ্দিন। বললো, 'বুজান, কী হইছে খুইল্লা কও তো!'

রাসুর মা খুলে বসল গল্পের ঝাঁপি। সেখান থেকে বেরিয়ে এলো এক আল্লাহওয়ালা পীর সাহেবের গল্প, যিনি গতকাল সোনারচরে আবির্ভূত হয়েছেন। উনি কোথা থেকে এসেছেন, কীভাবে এসেছেন তা সম্পর্কে কেউ ওয়াকিবহাল নয়। কারও কারও ধারণা—তিনি বাতাসে উড়ে এসেছেন, আবার কারও কারও মতে তিনি পানির ওপর হেঁটে সাগর পাড়ি দিয়ে এই সোনারচরে এসেছেন কেবল এখানকার গরিব মানুষগুলোর দুঃখ-কষ্ট লাঘব করতে। সবাই বলাবলি করছে—এই পীরের হাতে মাটিও সোনা হয়। পাথর হয়ে যায় বরফ। এই পীরের আবির্ভাবের পর থেকেই

সোনারচরে মানুষজনের ঢল নেমেছে। দল বেঁধে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা আসছে পীর সাহেবের পায়ের ধুলো নিতে। জানা গেছে—পীর সাহেবের ফুঁ দেওয়া পানি খেয়েই ভালো হয়ে গেছে শমসু তরফদারের নাতির পেটের অসুখ। মরতে বসা ওই বাচ্চাটার জীবন বাঁচানোয় শমসু তরফদার ওই পীর সাহেবের জন্য খানকা শরীফও বানিয়ে ফেলেছে।

নাজিমুদ্দিনের আগ্রহ যেন আকাশ ছুঁতে চায়। এমন কামেল পীর কেন আরও আগে এই তল্লাটে পা রাখেনি, সেই দুঃখটাও একটুখানি ঢু মেরে গেলো খুশিতে তড়পাতে থাকা নাজিমুদ্দিনের মনে।

রাত বাড়ে, রাসুর মায়ের গল্প থামে না। 'জানো নাজিমুদ্দিন, পীর সাবের এক্কেবারে নূরানি ছুরত। দেখলে মনে অইবো আল্লাহর ফেরেশতা নাইমা আসছে আকাশ থেইকা। হুনছি, চোখ বাঁইধলে পীর সাবে মক্কা-শরীফ দেখতে পায়। কতো বড় কামেল পীর ভাবো তাইলে?'

'তাঁতিপাড়ার ওপরে এইডা আল্লাহর খাস রহমত গো বু। নইলে দুনিয়ার এতো জায়গা রাইখা এমন পীরে আমগো এদিকে আইবো ক্যান, কও?', নাজিমুদ্দিন বলে।

'ঠিকই কইছো তুমি। এইটা আমাগো কপালের জোর।'

ঠিক হলো আগামীকাল ভোরে নাজিমুদ্দিন মতিকে নিয়ে পীর সাহেবের দর্শনে যাবে। মতির জন্য প্রাণভরে দুআ নিয়ে আসবে যাতে সে হেডমাস্টারের বলা বৃত্তিটা পেয়ে যায়। নাজিমুদ্দিনের বিশ্বাস—এই পীর মতির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেই সব হয়ে যাবে। যে পীরের ফুঁ দেওয়া পানি খেলে পেটের কঠিন অসুখ সেরে যায়, তার হাতের স্পর্শ পেলে যে-কারও ভাগ্যও যে বদলে যাবে—তা তো চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়। কিন্তু বাধ সাধে মতি। এই এতোক্ষণ পরে সে একটা কথা বলে উঠলো। ঠিক কথা নয়, যেন প্রতিবাদ করে উঠেছে নাজিমুদ্দিনের সরলমনা ছেলেটা।

মতি বললো, 'বাজান, আমার কাইলকা ইশকুল আছে। কতোগুলান পড়া জমা আছে তুমি জানো? আমি কোনোখানে যাবার পারুম না। তোমরা যাও গা।'

মতির এমন আস্পর্ধা, এমন দুঃসাহস আর দুর্মতি দেখে সবচেয়ে বেশি অবাক হয় রাসুর মা। পীর সাহেবের সোহবতে যেতে অস্বীকার করা মতিকে একপ্রকার

তিরস্কার করে রাসুর মা নাজিমুদ্দিনকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'নাজিমুদ্দিন, কী পোলা বানাইতাছো তুমি, হ্যাঁ? পোলা তো নয় যেন সাক্ষাৎ শয়তান দেখতাছি। পীরের বাড়িত যাইতে চায় না তোমার পোলায়। শয়তান না হইলে এমন কথা মুখ দিয়ে বাইর হয় ক্যামনে?'

অপমানটা বেশ ভালোভাবেই গায়ে মাখে দুরন্ত কিশোর মতি। সে বলে, 'আমারে নিয়া তোমার এতো ভাবা লাগবো না গো ফুফু। তুমি তোমার ঘর লইয়াই ভাবো। মাঠে আসার কালে দেখলাম ফুফা কাশতে কাশতে শেষ হইয়া যাইতাছে, আর তুমি কিনা পীরের কেরামতির গল্প বিলাইতে বিলাইতে হয়রান।'

আর নিতে পারলো না রাসুর মা। রাগ আর অপমানে যেন মাটির মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলেই বেঁচে যায়। যতো বড়ো মুখ নয় ছেলের ততো বড়ো কথা! নাজিমুদ্দিনের মতো ভদ্রগোছের কারও ঘরে এমন ইবলিশ যে পয়দা হতে পারে—তা যেন রাসুর মা বিশ্বাস করতে পারে না। শেষ জামানা যে চলেই এলো, এ বুঝি তারই সাক্ষী!

মাঝখানে কথা বলে ওঠে নাজিমুদ্দিন। মতিকে থামাতে চেয়ে বলে, 'মতি, কেমন কথা কস বড় মাইনষের লগে? তুই না গেলে না গেলি, তাই বইলা আরেকজনরে খোঁটা দিয়া কথা কইবি?'

মতি বিনীত সুরে বলে, 'না বাজান, আমি খোঁটা দিই নাই। ফুফার শইলের যে কী অবস্থা, মাঠে আওনের সময়ে দেখলা না তুমি? কাশতে কাশতে গলা দিয়া রক্ত আওনের জোগাড়। কেউ নাই যে এক গেলাস পানি আগাইয়া দিবো। ফুফার জায়গায় তুমি হইলে, তোমারে রাইখা মা যদি এমনে পীর-বাবার গুণগান গাইয়া পাড়া বেড়াইতো, তোমার কেমন লাইগতো কও তো?'

মতির বয়স কম, কিন্তু তার যুক্তি-তর্ক দেখে নাজিমুদ্দিনের মনে হলো—ছেলের যেন বয়স অনেক বেড়ে গেছে। আষাঢ় মাসের এমনই এক গুমোট-লাগা সময়ে মতির জন্ম। যেন সেদিনকার কথা, এখনো সবটা মানসপটে জ্বলজ্বল করছে। সেই মতি আজ ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দের তফাৎ করা শিখে গেছে। বুকের ভেতরে কোথায় যেন একটা আনন্দোৎসব লেগে যায় নাজিমুদ্দিনের। কিন্তু রাসুর মায়ের সামনে সেই আনন্দ উদযাপন করা যাবে না কোনোভাবে। নাজিমুদ্দিন নিজেকে সামলায়, এরপর শাসনের সুরে মতিকে পাল্টা জবাব দেয়, 'হইছে, তোর আর এইহানে মাথা দেওন লাগবো না। তুই ইশকুলেই যাইস। পীর-বাবার কাছে যাওনের

দরকার নাই তোর। আমি আর বুবু মিইল্যা যামু নে।'

কিন্তু নাজিমুদ্দিনের কথায় খুব একটা তৃপ্ত হতে পারে না রাসুর মা। রাগে গিজগিজ করতে করতে নাজিমুদ্দিনের মুখের ওপর বলে, 'একটা কালসাপ জন্ম দিছস রে, নাজিমুদ্দিন। পীর-বাবার কেরামতি নিয়া সন্দেহ করে তোর পোলা। আমি কইয়া গেলাম আইজ, তোর এই পোলা ঈমানহারা হইয়া মরবো।'

কথাগুলো বলতে বলতে, মাটিতে রাখা পিদিম হাতে তুলে নিয়ে, অন্য আরেকটা সরু আইল ধরে হাঁটা শুরু করে রাসুর মা। নাজিমুদ্দিনদের সাথে একই আইল ধরে বাড়ি যাওয়ার কোনো ইচ্ছে হয়তো বা আর নেই। অথবা, মতির মতো এমন দুর্মতিসম্পন্ন নাবালকের সাথে যাওয়াটাকে রাসুর মা হয়তো পাপ হিশেবে গণ্য করছে।

[দুই]

সোনারচরের যে খানকায় পীর সাহেব আসর পেতেছেন, সেখানে নিত্যনিয়ত শত মানুষের ঢল নামে। কেউ ব্যবসাপাতির উন্নতির বায়না নিয়ে আসে, কেউ আসে পেটের অসুখ থেকে মুক্তি-প্রার্থনা করতে। নানান মানুষের নানান চাহিদা। এমন বাহারি পদের চাহিদা মেটানোর আশা দেখানো পীর সাহেব একদিন এক ঘোরতর বিপদের ঘোষণা দিয়ে বসলেন। জানালেন, এই তল্লাটের মানুষের ভাগ্যাকাশে চরম এক বিপদের আনাগোনা তিনি টের পাচ্ছেন। আগামীকাল এক প্রলয়ংকরী ঝড়ে লন্ডভন্ড হতে যাচ্ছে সোনারচর এবং তার আশপাশের মানুষের জানমাল। তবে তিনি ধ্যান-মারফত আরও জ্ঞাত হয়েছেন, এই ঝড় দুনিয়ার আর যা ক্ষতিই করুক, পীর সাহেবের খানকার আশপাশে ঘেঁষার দুঃসাহস সে করবে না।

পীর সাহেবের মুখে আসন্ন দুর্দিনের দুঃসংবাদ শুনে ভেঙে পড়ে খানকায় আগত সকল মানুষ। ঘরে-বাইরে কান্নার রোল পড়ে যায়। কী করে বাঁচা যাবে এই বিনাশী ঝড়ের কবল থেকে, তা জানতে ভক্তকুল উদগ্রীব হয়ে ওঠে। তাদের ধারণা—এই ঝড় যতোই শক্তিশালী হোক, যদি পীর সাহেব চান, তাহলে মুহূর্তে সেটাকে উল্টোদিকে তাড়িয়ে দিতে পারবেন। বাতাসে উড়ে যিনি চোখের পলকে এক তল্লাট থেকে আরেক তল্লাটে চলে যেতে পারেন, তার সামনে এমন কতো ঝড় শক্তি হারিয়ে বিলকুল বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য তা নিয়েও ভক্তদের মাঝে মাতামাতির কমতি নেই।

দীর্ঘ ধ্যানমগ্নতার পরে, পীর সাহেব আসন্ন বিপদের হাত থেকে বাঁচার একটি উপায় নিয়ে হাজির হলেন সকলের সামনে। সবার মুখে মুখে ধন্যি ধন্যি রব পড়ে গেলো। আর কোনো দুশ্চিন্তা অবশিষ্ট নেই। ঝড়-তুফান এবার যা-ই আসুক, পীর সাহেবের অব্যর্থ মারণাস্ত্রের সামনে, ভয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে ব্যাটা যাবেই।

জনতার মঞ্চে উপস্থিত হলেন সুন্দর চেহারা এবং নিটোল স্বাস্থ্যের এক বৃদ্ধ। ঠিক বৃদ্ধ নয় যদিও, কিন্তু লম্বা আলখেল্লায় তাকে বেশ অনেকখানি বয়স্ক মনে হচ্ছে। হাতে আভিজাত্যের লাঠি। তাতে ভর দিয়ে, জনতার উদ্দেশে তিনি যা বললেন তার সারমর্ম নিম্নরূপ—

'সোনারচরের ওপর আসন্ন ঝড়ের তাণ্ডব অবশ্যম্ভাবী। তিনি হাজার রকমের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোনোভাবে এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ঝড়কে পোষ মানানো গেলো না। এই ঝড়কে এবার তিনি থামাতে পারবেন ঠিকই, কিন্তু পরের বার এই ঝড় আরও ভয়ংকর চেহারা নিয়ে হানা দিবে। পীর সাহেব যদি তার গোপন-অস্ত্র এবারেই প্রয়োগ করে ফেলেন, তাহলে পরের বারের প্রলয়ংকরী ঝড়কে থামানোর আর কোনো অস্ত্র তার হাতে অবশিষ্ট থাকবে না। তাই, এবার কিছু ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিয়ে এই ঝড়কে না আটকানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। জানের ক্ষতি যদিও এড়ানো সম্ভব নয়, কিন্তু, একটা উপায়ে মালের ক্ষতিটা এড়ানো পুরোপুরি সম্ভব।'

সকলের কৌতূহলী চোখ দ্বিগুণ কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলো, 'কোন সে উপায়?'

পীর সাহেবের পক্ষে নিযুক্ত এক খাদেম বললো, 'আপনারা তো জানেন দুনিয়ায় এমন কোনো বিপদ নাই, যা আমাদের পীর সাহেবকে স্পর্শ করতে পারে। আসন্ন ঝড়ের তাণ্ডবে সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও, আমাদের পীরের এই পবিত্র খানকার কোনো ক্ষতি করার দুঃসাহস বাতাসের নাই।'

সকলে মাথা নেড়ে সায় দিলো, যেন এই বিশ্বাস তাদের বহুযুগ পুরোনো, বহু আদিম এই জ্ঞান।

খাদেম পুনরায় বলতে শুরু করলো, 'আপনারা যদি আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, গহনা, টাকা-পয়সা এই খানকায় এনে রাখতে চান, রাখতে পারেন। আমাদের পীর সাহেবের যদিও বা তাতে খানিকটা অসুবিধে হবে, কিন্তু আপনাদের মালের নিরাপত্তার লক্ষ্যে তিনি এই অসুবিধায় বিব্রত হবেন না। আমাদের মহান এই পীরের

কাছে আপনাদের সুবিধাই সবকিছুর আগে।'

এমন জনদরদি, ভক্ত-দরদি পীর পেয়ে, সোনারচরের মানুষ নিজেদের আরেকবার ধন্য মনে করলো। তারা সবাই একবাক্যে রাজি হয়ে যার যার গুরুত্বপূর্ণ মাল, গহনাগাটি, জমানো টাকা-পয়সা পীরের খানকায় এনে জমা দিতে শুরু করে দিলো। যেহেতু মাত্রই আষাঢ় ঢুকেছে, তাই আকাশের ওপর আজকাল আর ভরসা করা চলে না। রোদ আর মেঘের লুকোচুরি প্রকৃতিজুড়ে। সেদিনও, বিকেল থেকে আকাশের কোণে মেঘ জমতে শুরু করেছে। কালো মেঘে ধীরে ধীরে ছেয়ে যাচ্ছে সোনারচরের আকাশ। আর, সাথে সাথে জনজীবনে জেঁকে বসছে এক অজানা আতঙ্ক।

[তিন]

ত্রস্ত-পায়ে, বিলের আইল ধরে এগিয়ে আসছে রাসুর মা। খানিক বাদে অন্ধকার নামবে। প্রকৃতি অন্ধকারে তলিয়ে যাবার আগে যে-করেই হোক রাসুর মাকে পীরের খানকায় গিয়ে, নিজের সারাজীবনের জমানো সম্বল, দুই ভরি সোনার গহনা জমা দিয়ে আসতে হবে। খেয়ে না-খেয়ে যে সম্বল রাসুর মা জমা করেছে, ঝড়ের তাণ্ডবে তা উড়ে বিলীন হবে—সেটা কোনোভাবে হতে দেওয়া যাবে না।

যাওয়ার পথে একবার নাজিমুদ্দিনের ঘরে ঢুঁ মারতে এলো রাসুর মা। নাজিমুদ্দিনকে তো বিপদের সংবাদ দেওয়া হয় নাই। সুপারি গাছের খোলের দরজা সরিয়ে, ঘরের ভেতরে চোখ ফেলে রাসুর মা বললো, 'নাজিমুদ্দিন ঘরে আছো?'

ঘরের এক কোণে বই-খাতা নিয়ে অঙ্ক কষছিল মতি। রাসুর মায়ের এমন হাঁকডাকে খাতা-কলম রেখে উঠে এসে বললো, 'বাপজান নাই।'

এই দুর্মতিসম্পন্ন নাবালকের সাথে কথা বলার কোনো শখ রাসুর মায়ের নেই, কিন্তু নাজিমুদ্দিনকে বিপদটা সম্পর্কেও সতর্ক করে যাওয়া দরকার। অগত্যা বাধ্য হয়েই, আগের রাগ কোনোভাবে নিজের ভেতর চাপা দিয়ে রাসুর মা বললো, 'শোন ব্যাটা, তোর বাপ আইলে কইস আইজ রাইতে কঠিন এক ঝড় আইবো দুনিয়ায়। আমাগো পীরে কইছে, ঝড়ে জান আর মালের ক্ষতি হইব। তয়, যাগো মাল পীরের খানকায় জমা থাকব, তাগো মালের কোনো কিচ্ছু হইব না। তোর বাপেরে বলবি, তোর মায়ের যদি কোনো গয়নাগাটি থাকে, তাইলে পুটলি বাঁইধা যেন পীরের খানকায় রাইখা আসে।'

বুড়ির এমন অবোধ বিশ্বাসে যেন বিরক্তিই হলো মতি। মুখের ওপরেই বললো কিনা, 'ফুফু, আমারে একটা কথা কও তো। ঝড় যদি আসে, ক্যান সেইটা তোমাগো পীরের খানকার ওপর দিয়া যাইব না? তোমাগো পীরের খানকা কি জাদু-মন্ত্র পড়া কোনো দালান যে ওইখানে ঝড় ধাক্কা খাইয়া পলাইবো?'

না, এখানে আর এক মুহূর্তও না। ভালো-মানুষি করে যাদের উপকার করতে এলো, তাদের কাছ থেকেই কিনা এমন ধারার অপমান! তবে চলে যাওয়ার আগে রাসুর মা মতিকে বললো, 'তাওবা কইরা দুআ-কালেমা পইড়া নিস। তোর তো ঈমানটাই চইলা গেলো রে দুর্মতি।'

কথাগুলো জপতে জপতে পীরের খানকার উদ্দেশে হাঁটা ধরল রাসুর মা। মতি সেদিকে তাকিয়ে আছে। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে এক অবোধ, অবুঝ বৃদ্ধার ছায়ামূর্তি।

[চার]

ভোর হলো। এক আলো ঝলমলে ভোর। সোনারচরের আকাশজুড়ে যেন আলোর মাখামাখি। গতরাতে যে বিপদ বয়ে যাওয়ার কথা ছিলো সোনারচরের ওপর দিয়ে, তা হয়তো বা কেউ টের পায়নি। কী আশ্চর্য! সবাই তো জেগেই ছিলো, তবুও ঝড়ের একটু রেশ কোথাও কেউ দেখতে পায়নি কেন? তবে কি শেষ পর্যন্ত পীর সাহেব কোনো এক গুপ্ত কৌশলে আটকে দিয়েছেন আসন্ন বিপদকে? 'তা-ই তো হবে', সবাই ভাবলো। পীর সাহেবের প্রতি ভক্তি আর শ্রদ্ধায় সোনারচরের মানুষগুলোর মাথা যেন আরেকবার নুইয়ে আসে।

বিপদ কেটে গেছে। সবাই দলবেঁধে, হই-হুল্লোড় করতে করতে পীর সাহেবের খানকার দিকে এগুতে লাগলো। ওই ভিড়ের মাঝে, ধীরপায়ে হেঁটে আসছে একজন বয়োবৃদ্ধ মহিলাও। রাসুর মা। 'পীর সাহেবের উসিলায় জীবনের শেষ এবং একমাত্র সম্বলটুকু এই যাত্রায় ভীষণ বাঁচা বেঁচে গেলো'—এই খুশিতে রাসুর মায়ের চোখ দিয়ে যেন কান্না চলে আসে।

কিন্তু, পীর সাহেবের খানকার কাছে এসে সবাই পাথর-মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। থেমে গেলো এতোক্ষণের সমস্ত হৈ-হুল্লোড়। এই দৃশ্য দেখার জন্যে সোনারচরবাসী কখনোই প্রস্তুত ছিলো না, প্রস্তুত ছিলো না রাসুর মাও। সবাই দেখছে—পীর সাহেবের খানকা শরিফের দুয়ারের একটা অংশ খোলা। ভেতরে পীর সাহেব নেই।

উনি ছুটেছেন অন্য কোথাও, অন্য কোনো সোনারচর এবং অন্য আরেক রাসুর মায়ের খোঁজে। নাজিমুদ্দিনের ছেলে মতির ঈমান কতোটুকু গেছে জানা যায়নি, তবে রাসুর মা জীবনের শেষ সম্বলটুকু যে খুইয়েছে, তা নিশ্চিত।

সুখ

[এক]

'বুঝলে ইয়াং ম্যান'—নিজের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন দীপ্ত চৌধুরি, 'সুখের প্রতিশব্দ হচ্ছে টাকা। টাকা থাকলেই জীবনে তুমি সুখী মানুষ। টাকা না থাকলে অসুখী। ভীষণ অসুখী। দুনিয়ায় কিছু ফালতু দার্শনিক আছে, ইউ নো? আমি তাদের বলি গবেট ফিলোসফার! এরা কী বলে জানো? এরা বলে, মানি ক্যান্ট বাই হ্যাপিনেস! হোয়াট দ্য হেল! টাকা দিয়ে নাকি সুখ কেনা যায় না! টাকায় কেনা যায় না এমন জিনিস দুনিয়ায় আছে নাকি আবার? হা হা হা।'

দীপ্ত চৌধুরির সামনে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছি আমি। আজ অফিসে আমার সপ্তম দিন। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি আরেকবার খলখলিয়ে হেসে উঠলেন। খুবই বিদঘুটে ধরনের হাসি। হাসি থামিয়ে বললেন, 'এই যেমন ধরো তোমার কথা। তুমি একজন ইয়াং, এনারজেটিক এবং খুবই স্মার্ট পারসন। কিন্তু তোমার মতো একজন লোক, যার কিনা যোগ্যতার কোনো কমতি নেই—তোমাকে কাজ করতে হচ্ছে নিতান্তই আমার পিএস হিশেবে। আমার সব কথা শোনা এবং তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই তোমার একমাত্র কাজ। এখন যদি বলি বাইরে গিয়ে গড়াগড়ি দাও, তাও তুমি দিতে বাধ্য। হা হা হা।'

আমি চুপ করে বসে আছি। চুপ করে বসে থাকা ছাড়া এখানে আমার আর তেমন কোনো কাজ নেই। আমার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো চুপচাপ এই লোকটার কথা

শুনে যাওয়া। বিরক্তি ধরে গেলেও, চেহারায় সদা-হাস্য ভাব জিইয়ে রেখে আমি লোকটার কথা শুনে যাচ্ছি। তিনি বলে যাচ্ছেন—'এর কারণ কী জানো? এর কারণ হলো তোমার টাকা নেই। টাকার জন্য আমার যাবতীয় কথা শোনা এবং তা পালনের ব্যাপারে তুমি চুক্তিবদ্ধ। টাকা নেই বলে তোমার সুখও নেই। সুখ কিনতে তোমার টাকা চাই। টাকার জন্যেই আজ তুমি এখানে। একেবারে সহজ সমীকরণ, তাই না ইয়াং ম্যান?'

আমি বললাম, 'স্যার, বেলা এগারোটায় মধুমিতা হলে আপনার উপস্থিত থাকার কথা। কোরিয়া থেকে যেসব বায়াররা আসবে, তাদের সাথে আপনার জরুরি মিটিং সারতে হবে। আপনি সম্ভবত ভুলে গেছেন।'

'নো নো ম্যান! আমি ভুলে যাইনি। এখন ক'টা বাজে দেখো তো?'

'স্যার, দশটা পাঁচ বাজে।'

'মোর দ্যান ফিফটি মিনিটস। এনাফ টাইম টু গো দেয়ার। তোমাকে যা বলছিলাম। কী যেন আলাপ করছিলাম তোমার সাথে? এই যাহ! ভুলে গেলাম আবার! আচ্ছা বাদ দাও। কাজের কথায় আসা যাক। তোমাকে আজকে খুব ইম্পরট্যান্ট একটা কাজ করতে হবে।'

'জি বলুন স্যার।'

'তোমাকে জুয়েলারি মার্কেটে যেতে হবে। চমৎকার দেখে তিনটে ডায়মন্ডের নেকলেস কিনবে। মনে রেখো, বাজার কিন্তু দুই নাম্বার ডায়মন্ডে সয়লাব। দেখে-শুনে কিনতে হবে। যাকে বলে চোখ-কান খোলা রাখা। যদি নকল ডায়মন্ড কিনে আনো, ইউ নো, হোয়াট আই উইল ডু উইদ ইউ।'

আমি এবারও চুপ করে আছি। তিনি বলতে লাগলেন, 'বাকি জীবন হয়তো তোমাকে জেলে পচে মরতে হবে। হা হা হা।'

আমাকে চাপা একটা ভয় দেখিয়ে দীপ্ত চৌধুরি ঘাবড়ে দিতে চাইলেন। আমি ঘাবড়াইনি দেখে তিনি বললেন, 'তোমার সাহস আছে বেশ। আই এপ্রিশিয়েইট ইট! বাই দ্য ওয়ে, তিনটে ডায়মন্ডের নেকলেস দিয়ে আমি কী করবো জানতে চাইলে না যে!'

'স্যার, এটা জিগ্যেশ করা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না।'

আমার উত্তরে এবার উনি দমে গেলেন খানিকটা। বেশ জমিয়ে কোনো গল্প শুরু করতে গিয়ে আগ্রহী শ্রোতা না পেলে গল্প-কথক যেভাবে নিদারুণ পর্যুদস্ত হয়, ঠিক সেরকম অবস্থা তার। কিন্তু দুরন্ত চালাক বলে তার এই অপ্রসন্নতা আমাকে তিনি বুঝতে দিলেন না। তার মোলায়েম কিন্তু হেঁয়ালি গলায় বললেন, 'গুড ডেলিভারি। তোমার পোস্টে আগে যারা ছিলো সবার কিন্তু এসব ব্যাপারে দুর্নিবার আগ্রহ থাকত। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জানতে চাইতো আমার কাছে। তুমি তাদের মতন নও জেনে ভালো লাগলো। অ্যানিওয়েজ, নেকলেস তোমাকে কিনতে হবে না। আমি শফিউলকে সাথে দিচ্ছি, সে নেকলেস কিনে তোমাকে দিলে তুমি সেগুলো নিয়ে মধুমিতা হলে চলে যেয়ো।'

কথাগুলো শেষ হলে দীপ্ত চৌধুরি হনহন করে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন। তার প্রস্থানের সাথে সাথে শফিউল নামের একজন এসে বললো, 'স্যার চলুন।'

দীপ্ত চৌধুরির পিএস হিশেবে এখানে আমি নতুন জয়েন করেছি। চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতাও এ আমার প্রথম। এখানেও যে কেউ আমাকে স্যার সম্বোধন করতে পারে তা আমার ভাবনাতে ছিলো না। ব্যাপারটা আমাকে তেমন আনন্দ না দিলেও খানিকটা সম্মান দিয়েছে।

শফিউল নামের লোকটার চেহারা ম্যাড়মেড়ে, কিন্তু তাতে চালাকির ষোলোআনা উপস্থিতি বিদ্যমান। আমার দিকে নিক্ষেপ করা তার চতুর দৃক্‌পাত সে বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। ভদ্রতার খাতিরেই আমি মুচকি হেসে জানতে চাইলাম, 'কোথায় যাবো?'

'নেকলেস কিনতে।'

'ও দায়িত্ব আমার নয়।'

'তা জানি। নেকলেস আমিই কিনবো। আপনি কেবল আমার সাথে যাবেন। গাড়ি থেকে আপনাকে নামতেও হবে না। আমি নেকলেস কিনে আপনার হাতে তুলে দেবো, আপনি সেগুলো স্যারের হাতে হ্যান্ড-ওভার করে দিয়ে আসবেন মধুমিতা হলে, ব্যস।'

রোগা এবং ম্যাড়মেড়ে চেহারা হলে কী হবে, কথা বলাতে এই লোক যে দারুণ পটু তা নিঃসন্দেহ। তবে, দীপ্ত চৌধুরি কবে শফিউলের কাছে গেলেন, কবে তাকে সব বুঝিয়ে দিলেন, আর কীভাবে অতো অল্প সময়ের ব্যবধানে তা নিতান্ত বাধ্য ছাত্রের মতো গিলে নিয়ে শফিউল আমার সামনে এসে দাঁড়ি-কম-সহ সেগুলো উগরে দিলো—তা এক বিরাট আশ্চর্য! মনে হলো সেকেন্ডের ব্যবধানে সব ঘটে চলেছে। অথবা হতে পারে—ভাবনার বেড়াজালে আমিই হয়তো সময়ের ব্যাপারে বেখেয়াল হয়ে পড়েছি।

[দুই]

গাড়িতে আমার পাশে শফিউল বসা। লোকটার মুখ থেকে জর্দার বিকট গন্ধ আমার নাকে এসে লাগছে। আমার যে তাতে বেশ অস্বস্তি হচ্ছে তা বুঝতে পেরেও লোকটা কথা বলার সময় একেবারে আমার মুখের ওপরে এসে পড়ছে। কী বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার! সহ্যের সীমা পার হয়ে গেলে আমি মুখ ফুটে বললাম, 'আপনি কি দয়া করে পান চিবানোটা বন্ধ করে দুটো কুলি করে আসবেন?'

হে হে করে হেসে ফেলে লোকটা বললো, 'আগে বলবেন না স্যার! তবে এই জিনিস কিন্তু ব্যাপক মজার! আমার ধারণা, যারা জর্দা দিয়ে পান খায় না, তারা দুনিয়ার এক বিরাট অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত। জীবনে একবার হলেও ট্রাই করবেন স্যার।'

আমি কথাগুলো না শোনার ভান করে গাড়ির কাচ নামিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। গাড়ি থামিয়ে শফিউল মুখ থেকে পানের চিবানো অংশটা ফেলে, বোতল থেকে চুকচুক করে পানি মুখে নিয়ে তা ফুস করে ছেড়ে দিলো কয়েকবার। তার কুলি-পর্ব শেষ হলে গাড়ি আবার চলতে আরম্ভ করলো।

'স্যার, আপনি কিন্তু বেশ ভালো মানুষ। তবে, ভালো মানুষদের কপাল খারাপ থাকে। তারা জীবনে উন্নতি করতে পারে কম। তাদের ঠকানো সহজ, কষ্ট দেওয়া সহজ, আরও সহজ...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'আপনার কেন মনে হলো যে আমি ভালো মানুষ?'

'ভালো মানুষ না হলে কি আর নিজের হাতে ডায়মন্ডের নেকলেস কেনার সুযোগ

ছাড়ে কেউ? এখানে যে বিরাট ধান্ধা করার জায়গা আছে, স্যার।'

'স্যরি, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'খুব সহজ। আপনার আগে যারা এই পোস্টে ছিলো, তারা এমন সুযোগগুলো একেবারে লুফে নিয়ে নিতো। দেখা যেতো, তাদের তিনটে ডায়মন্ডের নেকলেস কিনতে দিলে, সেখান থেকে এক লাখ টাকা তাদের পকেটে চালান হয়ে গেছে। দোকানদারকে হালকা কিছু দিয়ে ওই হিসাবের একটা মেমোও তারা জোগাড় করে রাখত। আপনার ঠিক আগেরজন তো এভাবেই চাকরি খোয়ালো। হয়েছে কী, তাকে তিনটে ডায়মন্ডের নেকলেস কিনতে পাঠালেন বড় স্যার। লোকটা তিনটে ডায়মন্ড থেকে দেড় লাখ টাকা পকেটে পুরে নিলেন আরামসে। কিন্তু তাতে খায়েশ মিটল না। আরও পাবার নেশায় নতুন এক চাল চাললেন। স্যারকে এসে বললেন, নেকলেসগুলো এতো খাঁটি আর দামি—স্যারের দেওয়া টাকাতে কিছুতেই সব কেনা গেলো না। তাই, কী আর করা, নিজের পকেট থেকে বাকি টাকা পরিশোধ করে তাকে নেকলেসগুলোর দাম পরিশোধ করতে হলো। কিন্তু কপালে বিপদ থাকলে যা হয়! সেদিন স্যারের মন-মেজাজ এতো বেশি খারাপ ছিলো যে, বেশি দাম দিয়ে কিনবার কথা শুনে স্যার তো রেগে-মেগে আগুন! বললেন, দাও, আমাকে এখনই জুয়েলার্সের ঠিকানা দাও। আমি নিজে গিয়ে ফেরত দিয়ে আসবো সেগুলো। কে বলেছে তোমাকে বাড়তি টাকা ঢালতে এগুলোর পেছনে?'

শফিউলের পান খাওয়ার মতো বদভ্যাস থাকলেও লোকটা গল্প-কথক হিশেবে দুর্দান্ত! তার কাহিনি বর্ণনার ধারা দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। আমি মুগ্ধ শ্রোতার মতো করে বললাম, 'তারপর?'

'তারপর আর কী! বড় স্যার ঠিকানা চাইলে না দিয়ে কি পারা যায়? ঠিকানা নিয়ে বড় স্যার সোজা চলে গেলেন ওই নেকলেসের দোকানে। গিয়ে ডায়মন্ডের নেকলেস তিনটে ফিরিয়ে দিয়ে টাকা ফেরত চাইলেন। কিন্তু বেচারারা তো হতভম্ব! যতো টাকা দিয়ে বেচে নাই, তার বেশি ফেরত কীভাবে দেবে? মাঝখান থেকে ধরা পড়ে গেলেন স্যারের পিএস। অতি লোভে গাজন নষ্ট।'

'তারপর কী হলো?'

'অনেক ঝামেলা। লোকটাকে মামলা দিলেন বড় স্যার। কী জানি, এখনো হয়তো

জেলের ঘানি টানছেন বসে বসে।'

আমি অস্ফুটে বললাম, 'আচ্ছা, এজন্যেই চৌধুরি সাহেব আমাকে নেকলেস কেনার ব্যাপারে ভয় দেখাচ্ছিলেন।'

'কিছু বললেন স্যার?'

'না, কিছু না। তবে একটা ব্যাপার মনে হলো। বড় স্যার কি সব সময় একসাথে তিনটে ডায়মন্ডের নেকলেসই কেনেন নাকি?'

আমার এই কথা শুনে শফিউল আরেকবার হে হে করে হেসে উঠলো। হাসি থামিয়ে বললো, 'সে আরেক কাহিনি স্যার। বড়লোকদের কাজ-কারবার তো, তাই একটু অন্যরকম।'

গল্প-কথক হিশেবে শফিউল ইতোমধ্যেই আমার মনে জায়গা দখল করে নিয়েছে। তার মুখ থেকে এই তিনটে নেকলেসের রহস্য-গল্পটাও শোনার লোভ তাই সামলানো গেলো না।

'অন্যরকম বলতে?'

শফিউল আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'সে বড় আজগুবি গল্প স্যার। বড় স্যারের সব সময় তিনটে ডায়মন্ডের নেকলেসই লাগে। আমার চাকরি-জীবনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম হতে দেখিনি কখনো।'

'স্যারের মিসেস বোধহয় একসাথে তিনটে নেকলেস না হলে উপহার গ্রহণ করেন না, তাই।'

'তা নয় স্যার। স্যারের মিসেস একটা নেকলেসই পায়। বাকি দুটোর একটা নেকলেস পায় স্যারের প্রেমিকা আফসানা ম্যাম।'

আমি বিস্মিত চেহারায় বললাম, 'প্রেমিকা? তার মানে?'

'প্রেমিকা মানে বান্ধবী, স্যার। স্যারের অন্তরঙ্গা বান্ধবী, কিন্তু বউ নয়। বড়োলোকদের এমন কতো বান্ধবীই থাকে। এগুলো বড়োলোকি সমাজের কালচার। এসব না হলে সেই সমাজকে বড়োলোক সমাজ বলা যায় না।'

'আর পরের নেকলেসটা?'

'ওটা আজকে মধুমিতা হলে যে পতিতা মেয়েটার সাথে স্যারের ডেট হবে, ওর জন্য। বড়োলোক মানুষ, পতিতাকেও ডায়মন্ডের নেকলেস উপহার দিতে এদের গায়ে লাগে না।'

'কিন্তু ওখানে তো বিদেশি বায়ারদের সাথে স্যারের মিটিং হওয়ার কথা। আপনি ডেটের কথা বলছেন কীভাবে?'

তৃতীয়বারের মতো হাসিতে ফেটে পড়লো শফিউল। একগাল হাসি মুখে ধরে রেখে সে বললো, 'আমার চাকরি-জীবনের দশ বছর এখানে শেষ হতে চলল স্যার। এখানকার অলিগলি আমার চাইতে ভালো কি আপনি জানবেন? এ রকম বায়ারদের মিটিংগুলোতে একদল পতিতাকে হায়ার করা হয় বড়লোকদের সন্তুষ্টির জন্যে। মেয়ে আর মদ ছাড়া এদের আবার মিটিং হয় নাকি?'

আমার মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগলো। মস্তিষ্কের কোষগুলোতে যেন দারুণ এক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। খুব ভালো হতো যদি শফিউলের কাছ থেকে এই গল্পটা না শুনতে চাইতাম।

'তার মানে, তার এমন জঘন্য একটি কাজ সম্পন্ন করার জন্য যে নেকলেস ব্যবহার করা হবে, তা আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে মধুমিতা হলে?'

'জি স্যার, আজকে ওটাই আপনার দায়িত্ব।'

আমি চিৎকার করে ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললাম। আমার এমন চিৎকারে হতভম্ব হয়ে গেলো শফিউল। আমি কী করতে যাচ্ছি তা হয়তো সে বুঝে উঠতে পারছে না।

গাড়ি থেকে নেমে শফিউলকে বললাম, 'এই জঘন্য গল্পটা না শুনলে যদিও মনটা শান্ত থাকত, তবুও সেটা আমাকে জানানোর জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার বড় স্যারকে বলবেন, আমি স্বেচ্ছায় তার চাকরি থেকে ইস্তফা দিলাম। একজন চরিত্রহীন নিকৃষ্ট লোকের পিএস হয়ে থাকার চাইতে হাতিরঝিলে থালা হাতে নিয়ে ভিক্ষে করাটা আমার কাছে অধিক সম্মানের।'

গাড়ির দরজা লাগিয়ে দিয়ে আমি হাঁটা ধরলাম। পেছন থেকে শফিউলের বলা কথাগুলো আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, 'বলেছিলাম স্যার, ভালো মানুষদের কপাল খারাপ থাকে, তারা জীবনে উন্নতি করতে পারে কম।'

[তিন]

সারাদিন আর বাসায় ফিরলাম না। বুড়িগঙ্গার অদূরে বসে, ঢেউয়ের উত্থান-পতন দেখতে দেখতে কাটিয়ে দিলাম পুরোটা বিকেল। সূর্যের শেষ রক্তিম আভাটুকুও যখন মিলিয়ে গেলো, তখন কেমন যেন শীত শীত অনুভব হলো। মুয়াজ্জিনের করুণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো বাতাসে। মাগরিবের ওয়াক্ত হলো। প্রকৃতিজুড়ে একটা স্নিগ্ধ আবেশ ঘরে ফিরবার প্রস্তুতিকে আরও ত্বরান্বিত করার আস্কারা দিয়ে গেলো। লালবাগ কেল্লার পাশ ঘেঁষে বাজারের ভেতরে যে পুরাতন মসজিদটি আছে, তার দিকে মুসল্লীদের একটা জনস্রোত এগিয়ে চলেছে ধীর পায়ে। মসজিদমুখী সেই মিছিলে আমিও নিজেকে বিলীন করে দিলাম।

সালাত শেষ করে জোর কদমে হেঁটে চলে এলাম জগন্নাথের মোড়। হাজার হাজার মানুষের পদচারণায় জায়গাটা গমগম করছে। হঠাৎ খেয়াল করলাম—ভিক্টোরিয়া পার্কের ওদিক থেকে, একটা ছোট্ট মেয়ে কিছু ফুলের মালা হাতে এগিয়ে আসছে। আমার কাছাকাছি এসেই সে বললো, 'বাইয়া, শিউলি ফুলের মালা লইবেন?'

পকেটের আমার সকরুণ অবস্থা! ফুলের মালা নিলে গাড়ি ভাড়া দিতে পারব না, গাড়ি ভাড়ার কথা ভাবলে ফুল নেওয়া হবে না। চরম দোটানায় শেষ পর্যন্ত ফুলের মালারই জিত হলো। আজ না-হয় ল্যাম্পপোস্টের আলো ধরে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যাবো ঘরে। মেয়েটাকে বললাম, 'কতো করে মালা?'

'দশ ট্যাকা।'

'কয়টা আছে তোমার কাছে?'

'চাইট্টা।'

'চারটাই দাও আমাকে। এই নাও চল্লিশ টাকা।'

ফুলের মালাগুলো আমার হাতে দিয়ে, টাকাগুলো হাতের মুঠোয় পুরে মেয়েটা দিলো এক ভৌঁ-দৌড়। আজ এতো তাড়াতাড়ি তার ছুটি! সে সম্ভবত বিশ্বাস করতে পারছে

না। টাকাগুলো নেওয়ার সময় তার চোখ দুটো ঝলমল করছিল। মুখে সে কি তৃপ্তির হাসি! আচ্ছা, এটা কি সুখ নয়? এই যে অল্পের গল্প, এই গল্পে কি সুখ নেই?

আমি ল্যাম্পপোস্টের আলো ধরে ধরে হাঁটছি। আজ আমারও ছুটি। একটা দোযখের আস্তানা থেকে মুক্তি মিলেছে। আমার হাতে শিউলি ফুলের চারটে মালা। আমার স্ত্রী রেবেকার জন্য। রেবেকা যখন দুআর খুলে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াবে, আলতো করে একটা মালা আমি তার খোঁপায় গুঁজে দেবো। আমি জানি সে খুব খুশি হবে। আনন্দ আর আহ্লাদে দৌড়ে সে আয়নার কাছে গিয়ে জানতে চাইবে, 'আমাকে সুন্দর লাগছে না?'

আমি বলব, 'একটা ফুলের গায়ে চড়েছে অন্য একটা ফুল। কোন ফুলটাকে যে বেশি সুন্দর লাগছে সেটা নির্ণয় করা কঠিন। বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি।'

আমার কথায় লজ্জা পেয়ে রেবেকা একেবারে কুঁকড়ে যাবে।

আমি তো ভীষণ সুখে আছি। একজীবনে সুখী হতে আর কী লাগে?

বোধ

[এক]

আজ সকাল সকাল বের হতে হবে শাওনকে। দুই জায়গায় দুটি শিডিউল দেওয়া আছে তার। প্রথমেই যেতে হবে গৌরিপুর হাসপাতালে। সেখানে মামুনের স্ত্রীকে ভর্তি করানো হয়েছে। ডেলিভারি কেইস। গতকাল রাত দেড়টায় মামুন ফোন করে জানিয়েছে তার স্ত্রীর রক্ত লাগবে। একেবারে সকাল সকাল না পেলে অবস্থা বেগতিক আকার ধারণ করবে। ফোনে মামুন পারলে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়! অনুরোধের সুরে বারবার বলতে লাগলো, 'দোস্ত, আসবি তো? বল না রে! সত্যি সত্যিই কি আগামীকাল আসবি হাসপাতালে? তোর ভাবির খুব ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশান যাচ্ছে। তুই ছাড়া এমন কেউ নাই যে আগামীকাল ভোরে এসে রক্ত দিতে পারবে। প্লিজ দোস্ত, কথা দে আসবি?'

এমনিতেই ফোনের রিংটোন বেজে ওঠায় মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেছে শাওনের; তার ওপর মামুনের এ রকম ন্যাকা-কান্না শুনে তার সত্যি সত্যিই রাগ চড়ে গেলো। মাথাটাও ঘুরতে লাগলো ভনভন করে। ফোনের ওপাশে মামুনের নাক্যামো মার্কা কান্না যেন থামছেই না। একপর্যায়ে শাওন বিরক্ত হয়ে বললো, 'থামবি তুই? বললাম না আগামীকাল ঠিক সময়েই হাসপাতালে থাকব? একটা কথা কি হাজারবার বলা লাগে?'

শাওনের একপ্রকার ধমক শুনে একটু থামল মামুন। বললো, 'দোস্ত, রাগ করিস না। ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশানে পড়েই তোর কাছে ধরনা দিয়েছি। আমার হাতে যদি

আরও কয়েকটি অপশান থাকত তাহলে তোকে এভাবে জ্বালাতন করতাম না। বিশ্বাস কর।'

শাওন রাগতস্বরে বললো, 'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কিছু নেই। তোকে আমি বেশ স্বাভাবিকভাবেই বলেছি যে, আগামীকাল ঠিক সময়ে আমি উপস্থিত হয়ে যাবো। কিন্তু তুই বেচারা তো আমার কোনো কথাই শুনছিস না। কানের ওপর ঘ্যানর ঘ্যানর করেই যাচ্ছিস। তার ওপর তোর নাকি-কান্না তো আছেই। বিরক্তি উঠে যায় না একটা মানুষের, বল?'

শাওনের গোছালো শাসনে মামুন চুপ মেরে গেলো। কারও মুখেই কোনো কথা নেই। দুই প্রান্তেই এক নিঃসীম নীরবতা। নীরবতা ভেঙে শাওন বললো, 'চিন্তার কিছু নেই। আগামীকাল যতো যা-ই হোক, তুই আমাকে ঠিক সময়ে হাসপাতালে দেখবি। এইটুকু ভরসা তুই আমার ওপরে রাখতে পারিস।'

মামুন খুব ধীর এবং শান্ত গলায় বললো, 'ধন্যবাদ দোস্ত।'

মামুনের ধন্যবাদ শোনার জন্য ফোনের ও'প্রান্তে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকবে—এতো ধৈর্য আর শাওনের কই? তার ধন্যবাদ বাতাসের তরঙ্গে ভেসে তার কান অবধি পৌঁছানোর আগেই সে ফোনের লাইন কেটে শুয়ে পড়েছে।

শাওনের অন্য শিডিউলটি ক্যাম্পাসের। তাদের আজ একটা ডিপার্টমেন্টাল প্রোগ্রাম আছে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো প্রোগ্রামের সব দায়-দায়িত্ব চেপেছে শাওনের কাঁধেই। মোটামুটি রকমের একটা ঝামেলায় পড়ে গেলো সে। দুই জায়গায় যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে যথাসাধ্য কার্য সমাধা করা সমান গুরুত্বপূর্ণ। একটা বাদ দিয়ে আরেকটা বেছে নেওয়ার মতো সুযোগ এখানে নেই।

সকালে বের হওয়ার পথে শাওনের মা ডাক দিয়ে বললো, 'এতো তাড়াতাড়ি তো কখনোই যাস না। আজ যাচ্ছিস যে?'

শাওন ঘাড় বাঁকিয়ে উত্তর দিলো, 'কখনোই যাই না বলে যে আজ যেতে পারবো না—এমন কোনো নিয়ম আছে নাকি?'

ছেলের কথা শুনে শাওনের মা চুপ মেরে গেলেন একদম। তিনি খুব ভালো করেই জানেন তার ছেলে কোনোদিন সোজা কথার সোজা উত্তর দেয় না। তাকে যখন

মাছের কাঁটা বেছে মাছ খেতে দেওয়া হতো সে প্লেট ঠেলে দিয়ে বলতো, 'কাঁটার জন্য মাছ খাবো না—তা তো বলিনি। মাছ খাবো না বলেছি, কারণ—মাছ খেতে আমার ভালো লাগে না। শুধু শুধু বাড়তি আদিখ্যেতা দেখাতে এসো না প্লিজ। বিরক্তি লাগে।'

ছেলের এমন অদ্ভুত আচরণে খুব আহত হন রাহেলা বেগম। বাপ-মরা একমাত্র ছেলে তার। কতো স্বপ্ন যে ছিলো তাকে ঘিরে! কিন্তু বড় হওয়ার সাথে সাথে ও এমন বেপরোয়া হয়ে উঠলো যে রাহেলা বেগম এখন নিজের ছেলেকেই মাঝেমধ্যে চিনতে পারেন না। এ যে তার পেটে ধরা সন্তান—সেটাও কেমন অবিশ্বাস্য ঠেকে। স্বভাবে, আচরণে সে এখন চরম খিটখিটে। যে দু'চোখে রাহেলা বেগম ছেলেকে নিয়ে একরাশ স্বপ্ন বুনেছিলেন এতোদিন, তা আজ কান্নার অথৈ সাগরে পরিণত হয়েছে। স্বামী আযহার উদ্দিনের স্বপ্ন ছিলো ছেলেকে আলেম বানাবেন। শাওনের যখন সাড়ে তিন বছর বয়স তখন থেকেই তাকে নিয়ে রোজ মসজিদে চলে যেতেন আযহার উদ্দিন। ছেলেকে পাশে দাঁড় করিয়ে সালাত আদায় করতেন তিনি। এতো ছোট্ট বাচ্চাকে মসজিদে আনতেন বলে অন্য মুরব্বি-মুসল্লীরা প্রায়ই দু-চারটি কথা শোনাতেন আযহার সাহেবকে। কিন্তু এসবে একেবারেই পাত্তা দিতেন না তিনি। তার কথা একটাই—ছোটো বাচ্চারা ছোটোকালে যা শেখে সেটা তারা সব সময় মনে রাখতে পারে। মসজিদে আসা শিখলে বড়ো হয়েও মসজিদে আসবে।

আযহার উদ্দিনের এই চিন্তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বাবার হাত ধরে খুব ছোটোবেলাতেই মসজিদে আসা-যাওয়া করা ছেলেটি বড়ো হয়ে মসজিদমুখী হয়নি বললেই চলে। বাবার শেখানো সব বিদ্যে সে ভুলে বসে আছে। অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়ে একেবারে বখে গেছে সে। অথবা হতে পারে অবাধ স্বাধীনতাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাহেলা বেগম প্রায়ই বিড়বিড় করে বলেন, 'অতিরিক্ত স্বাধীনতাও একরকম পরাধীনতা।'

পায়ে মোজা পরতে পরতে শাওন বললো, 'দুপুরে খাবো না। ফোন কোরো না।'

রাহেলা বেগম জানতে চাইলেন, 'খাবি না কেন? কোথায় খাবি তাহলে?'

মায়ের দিকে অগ্নিদৃষ্টি দিলো সে। তার চোখ থেকে যেন আগুনের ফুলকি ঠিকরে বের হচ্ছে। খুব কঠিন চেহারায় সে বললো, 'জাহান্নামে খাবো, বুঝতে পেরেছো? কতবার বলেছি আমার ব্যাপারে বেশি নাক গলাতে আসবে না। যখন বলেছি খাবো

না, তখন খাবো না, ব্যস। বারবার প্রশ্ন করে জানতে চাইবে না—কেন খাবো না, কোথায় খাবো যত্তসব!'

রাহেলা বেগম দ্বিতীয়বারের মতো চুপ মেরে গেলেন। ছেলের এমন স্বভাবের সাথে তিনি আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এমন কদর্য ব্যবহারে আগে রাহেলা বেগমের চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি ঝরতো; এখন আর তেমনটা হয় না। এখন চোখ আর মন—দুটোই কেমন যেন শক্ত হয়ে যাচ্ছে। সময় যে মানুষকে কতভাবে ভাঙে-গড়ে—ভাবেন রাহেলা বেগম। আগে কষ্ট লাগত, বুক ফেটে চৌচির হতো ছেলের এহেন আচরণে। আজকাল এসব দেখে মনের ভেতরে আর হাহাকার হয় না। বুক ফেটে কান্না আসে না। মাঝে মাঝে রাহেলা বেগমের মরে যেতে ইচ্ছে করে। সিজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহর কাছে নিজের মৃত্যু কামনা করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু চাইলেই তো আর পারা যায় না। হাদিসে নিজের মৃত্যু চাইতে নিষেধ করা হয়েছে বলে তিনি ধৈর্য ধরে আছেন।

শাওন যখন বের হতে যাবে তখন তিনি আবার বললেন, 'যদি একটু সময় দিতি তাহলে টিফিন ক্যারিয়ারে হালকা কিছু নাস্তা দিয়ে দিতাম। তোর জন্য ভোর থেকেই শীত-পিঠা বানাচ্ছিলাম।'

কিছুই বললো না শাওন। শুনতে পায়নি—এমন ভান করে বাসা থেকে হনহন করে হেঁটে বেরিয়ে গেলো। তার চলে যাওয়ার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রাহেলা বেগম। ছেলের চলে যাওয়ার দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ে যায় অতীতের কথা। শাওন যখন তার বাবার সাথে মসজিদে যাওয়ার জন্য অথবা স্কুলে যাওয়ার জন্য বের হতো, তখন সে বারবার পেছন ফিরে মায়ের দিকে তাকাতো। হাত নেড়ে মুচকি হেসে মাকে বিদায় জানাতো। দরজার আড়াল থেকে তিনিও হাত নেড়ে ছোট্ট সোনামণিটাকে বিদায় দিতেন। মা-ছেলের চোখে চোখে কথা হতো। সেই ছেলে আজ এতো অবাধ্য, এতো উচ্ছৃঙ্খল আর বেপরোয়া হয়ে পড়বে—তা রাহেলা বেগম স্বপ্নেও ভাবেননি।

[দুই]

শাওন কথা রেখেছে। নির্ধারিত সময়ের আগেই সে গৌরিপুর হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে। রোগীদের আসা-যাওয়া এবং চিৎকার-চেঁচামেচিতে গমগম করছে পুরো হাসপাতাল এলাকা। শাওনকে দেখামাত্র একরকম দৌড়ে তার কাছে এলো মামুন;

চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপ। চিন্তা আর অস্থিরতায় শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে সে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে শাওনকে বললো, 'থ্যাংক ইউ, দোস্ত। অনেক বড়ো উপকার করলি আজ। তুই না এলে...'—মামুন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার অব্যক্ত এবং অসমাপ্ত কথাগুলো শোনবার সময় কিংবা ইচ্ছে—কোনোটাই হয়তো নেই শাওনের। সে মামুনকে থামিয়ে দিয়ে জিগ্যেশ করলো, 'ভাবির কী অবস্থা এখন?'

'অবস্থা তো খুবই ক্রিটিক্যাল। ব্যাপক ব্লিডিং হয়েছে। দ্রুত ব্লাড না দেওয়া গেলে...'

'ব্লাড নেওয়া হবে কখন?'

'এই তো, আর একটু পরেই।'

শাওন আর কোনো কথা বললো না। হাসপাতালের করিডোরে পেতে রাখা একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বাম পায়ের ওপর ডান পা রেখে সে চোখ দুটো বন্ধ করলো—অপেক্ষা কখন ডাক্তারের ডাক আসবে আর তাকে রক্ত দেওয়ার জন্যে যেতে বলবে। মামুনও বিশেষ কোনোকিছু বলতে গেলো না আর। তার রগচটা বন্ধু শাওনকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। পরোপকারী, কিন্তু ভীষণ আত্মাভিমানী। বেশ অহংকারীও—কিন্তু তা কেবল পরিস্ফুটিত হয় নিজের আত্মমর্যাদা এবং আত্ম-জগতের বেলাতেই।

শাওনের যে অন্য আরেকটা জায়গাতেও জরুরি তলব আছে—তা মামুনকে বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বলা গেলো না। তার বিপন্ন আর বিপর্যস্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে মনে হলো—শাওনের অন্য কাজের গুরুত্ব বুঝবার মতন অবস্থা এখন মামুনের নেই। বিপদগ্রস্ত মানুষের কাছে নিজের বিপদ ব্যতীত বাকি দুনিয়াটাই গৌণ।

ব্লাড দেওয়া শেষে শাওন আবার হাসপাতালের করিডোরে ফেরত এলো। তাকে দেখামাত্র জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল মামুন। শাওনের আজকের উপকারের কথা সে কোনোদিন ভুলবে না, বন্ধুর এই ঋণ কোনোভাবেই শোধ করতে পারবে না সে—এ জাতীয় কথা বলতে বলতে একেবারে শিশুদের মতন কাঁদতে লাগলো। তার কান্না দেখে আশপাশের লোকজনও ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে ওদের দিকে। শাওন যে বিরক্ত হচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে যে কড়া কোনো ধমক দিয়ে থামিয়ে দেবে—সেটা করা যাচ্ছে না। বেচারা পত্নী আর অনাগত সন্তানের জন্য চরম দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায় কাতর। এহেন মুহূর্তে তাকে সান্ত্বনা না

দিয়ে শাসন করতে গেলে সে ভেতর থেকেই ভেঙে পড়তে পারে।

শাওন বললো, 'আমাকে বেরুতে হবে এবার। একটা জরুরি কাজ আছে হাতে।'

তার চলে যাওয়ার কথা শুনে মামুন শার্টের হাতায় চোখ মুছতে মুছতে বললো, 'চলে যাবি মানে? আমার সন্তানের মুখ দেখে যাবি না?'

শাওন খেয়াল করলো সন্তানের কথা বলতে গিয়ে বেশ অদ্ভুতরকমভাবে, ভোজবাজির মতন পাল্টে গেলো মামুনের চেহারা। বিষণ্ণতায় নুইয়ে পড়া মুখাবয়বে হঠাৎ যেন আনন্দের ঝিলিক খেলে গেলো। মামুনকে এ রকম উৎফুল্ল আর উৎসুক দেখে শাওন জানতে চাইল, 'সন্তানের জন্য অধীর অপেক্ষায় আছিস মনে হচ্ছে!'

হেসে ফেলল মামুন। কান্নার আবহ-মিশ্রিত সে এক অদ্ভুত সুন্দর হাসি! তাকে দেখে কে বলবে যে—খানিক আগেও সে একেবারে বাচ্চা মানুষের মতন কেঁদেছিল? তার চেহারা এবং মনের এমন ত্বরিত পটপরিবর্তন দেখে শাওনও সামান্য বিভ্রান্ত হলো।

মামুন বললো, 'সন্তান যে কী জিনিস তা বাবা হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনোদিন বুঝবি না।'

শাওন চুপ করে রইলো। মামুনের কথাটার ভারত্ব আর নিগূঢ় অর্থটা তাকে একটা সজোরে আঘাত দিয়ে গেলো যেন। কিন্তু সে আঘাত অপমানের নয়, অপরাধবোধের। সন্তানের বাবা না হওয়া পর্যন্ত এই আনন্দ, এই দুশ্চিন্তা, এই আবেগ আর অপেক্ষার মর্ম বোঝা কোনোদিন কি সম্ভব নয়? শাওনের মনে পড়ে গেলো তার বাবার কথা। যেদিন সে পৃথিবীতে আসে সেদিন তার বাবাও কি এমন অধীর আগ্রহে প্রহর গুনেছিল তার জন্যে? এ রকম কোনো এক ভোরে, হাসপাতালের কোনো এক করিডোরে তার বাবাও কি ভয় এবং আশার সম্মিলিত আনন্দ আর দুর্ভাবনা নিয়ে পায়চারি করেছিলো একদিন? বাবার স্মৃতি আবছা আবছা মনে করতে পারে সে। সেই আবছা স্মৃতির সবটুকু বাবার আদর আর ভালোবাসায় মাখামাখি। বাবার কাঁধে উঠে বেড়ানো, বুকের ওপর ঘুমিয়ে পড়া, বাবার হাত ধরে স্কুলে যাওয়া, একসাথে আইসক্রিম খেতে খেতে বাসায় ফেরা—স্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে সমস্ত কিছু যেন আজ শাওনের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে চাইছে।

মামুনের কথায় ভাবনায় ছেদ পড়লো। সে বললো, 'কী হয়েছে রে? বেশ চিন্তিত লাগছে তোকে।'

অস্ফুট হেসে মামুনের আশু দুর্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে শাওন বললো, 'না, ও কিছু না। আচ্ছা, ভাবির কী অবস্থা বল তো? তোর মতোই কি অনাগত সন্তানের জন্য দিলপ্রাণ উজাড় করে দিয়ে অপেক্ষা করছেন?'

আবার হেসে উঠলো মামুন। এবারের হাসিতে দুর্ভাবনার কোনো চিহ্ন নেই; বরং তাতে সাহস আর শক্তির এক অদ্ভুত আভাস দেখতে পেলো শাওন।

মামুন বললো, 'কী যে বলিস তুই! একজন মা তার সন্তানের জন্য যে ব্যাকুলতা নিয়ে অপেক্ষা করে, একজন বাবার ব্যাকুলতা তার হাজার ভাগের এক ভাগও হবে না। অসহ্য সব যন্ত্রণা আর ভোগান্তি মুখ বুজে সহ্য করে দশটা মাস যে জঠরে বড় করে তোলে সন্তানকে, ভাবতে পারিস কতটা ত্যাগ তাতে জড়ানো থাকে? একবার কী হয়েছে জানিস? আমার স্ত্রী একদিন আমায় বললো, যদি সন্তান জন্মের সময় অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, হয় সন্তান বাঁচবে না-হয় মা; তখন কিন্তু তুমি আমার কথা মোটেই মাথায় আনবে না, বুঝলে? আমার সন্তানই যেন আমার ওপরে প্রাধান্য পায় তোমার কাছে। আমি না থাকলেও সে যেন বেঁচে থাকে এই পৃথিবীর আলো-বাতাসে।'

সেদিন তার কথাগুলো শুনে আমার এতো খারাপ লেগেছিল, তাকে জড়িয়ে ধরে আমি হাউমাউ করে কেঁদেছিলাম।

শাওনের কোনো ভাবান্তর নেই। মুখাবয়বের অবস্থা দেখে মনে হলো সে মামুনের কথাগুলো শুনতেই পায়নি। কিন্তু তা সত্য নয়। শাওনের মনের ভেতর যে অশান্ত ঝড় উঠেছে, বোধোদয়ের যে তীব্র জলোচ্ছ্বাস শাওনের বুকের ভেতর তাণ্ডব চালাতে শুরু করেছে—তা বহু কষ্টে সে লুকোনোর চেষ্টা করছে। একজন মা যে নিজের জীবন বিপন্ন করে দিয়ে হলেও অনাগত সন্তানের সুরক্ষার কথা ভাবতে পারে—শাওন তা কোনোদিন কল্পনাতেও ভাবেনি। তিলে তিলে নিজের শরীরের ভেতরে যে আরেকটা শরীর একজন মা বড় করে তোলে, তার জন্যে কী অপরিসীম মায়া, কী অফুরান ভালোবাসা জমা করে রাখে বুকে—সেই চিন্তা করবার ফুরসতও কোনোদিন মেলেনি শাওনের। কী বোকা, নির্বোধ, নির্লজ্জ আর অকৃতজ্ঞ শাওন!

এমন সময় শাওনের কল্পনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটা নারীমূর্তির ছায়া। সেই ছায়া আর কার হবে, রাহেলা বেগম ছাড়া? সেই মায়াজড়ানো দুটো হাত, সেই আদর-বিগলিত মধুমাখা ডাক, সেই ভালোবাসা-মিশ্রিত স্পর্শ—ছোটোবেলার স্মৃতির অন্ধকার ফুঁড়ে আজ সদলবলে যেন শাওনের সামনে জড়ো হতে শুরু করেছে। শাওন আবার

ভাবনার অতলে তলিয়ে যায়। সে দেখতে পায় তার বাবার হাত দুটো বেশ শক্তভাবে ধরে আছে তার মা রাহেলা বেগম। চোখের জলে তার বুক ভেসে যাচ্ছে। বাবাকে উদ্দেশ্য করে তার মা বলছে, 'যদি সন্তান জন্মের সময় অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, হয় সন্তান বাঁচবে না-হয় মা; তখন কিন্তু তুমি আমার কথা মোটেই মাথায় আনবে না, বুঝলে? আমার সন্তানই যেন আমার ওপরে প্রাধান্য পায় তোমার কাছে। আমি না থাকলেও সে যেন বেঁচে থাকে এই পৃথিবীর আলো-বাতাসে।'

কল্পনায় ছেদ পড়লো শাওনের। পাশের অপারেশান থিয়েটার থেকে উঁচু স্বরে ভেসে আসছে এক নবজাতকের চিৎকার-কান্না। সেই কান্নায়, শাওন দেখতে পেলো—সবচেয়ে বেশি ধড়ফড়িয়ে উঠেছে মামুন। উন্মাদের মতো করে সে এক দৌড়ে অপারেশান থিয়েটারের সামনে চলে গেলো। এতোটা তাড়িত-স্বভাব মামুনের মাঝে কখনোই দেখা যায়নি আগে। তবে কি, সন্তানের সাথে সাথে বাবা-মায়েরও নতুন করে জন্ম হয়?

শাদা-পোশাক পরা একজন নার্স অপারেশান থিয়েটার থেকে বের হয়ে এলেন। তার কোলে তোয়ালেতে মোড়ানো এক নবজাতক, যার কান্না হুড়মুড় করে বাড়িয়ে দিয়েছে হাসপাতাল করিডোরের ব্যস্ততা। নার্স হাসিমুখ করে বললেন, 'এই যে মামুন সাহেব, আপনার মেয়ে হয়েছে।'

সন্তান লাভের সে অপার্থিব আনন্দে চোখমুখ ঝলমল করে উঠলো মামুনের। চোখে অশ্রু তো আগে থেকেই আছে, এবার সে অশ্রু পারলে নায়াগ্রার ঢল হয়ে নামতে শুরু করে! নার্সের কোল থেকে একপ্রকার ছোঁ মেরে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে মামুন সে কী কাণ্ডকারখানা সেদিন শুরু করেছিলো তা দেখে অ-মুখরা স্বভাবের শাওনও একবার হেসে ফেলল। সন্তান পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠা মামুনকে দেখে শাওনের ভেতরে এক নতুন অনুভূতির সৃষ্টি হয়। সেই অনুভূতি শাওনকে চমকিত করে। সে অনুভূতি শাওনকে এনে দাঁড় করায় ভাবনার এক নতুন দ্বারে।

[তিন]

বাইরে বেরিয়ে আসে শাওন। সকালের সোনা-রোদ এখনো মিলিয়ে যায়নি। মোবাইল বের করে একবার দেখে নেয় সে। অজিত, মিঠু, মনির আর সাব্বিরদের অসংখ্য মিসড-কলে ভর্তি মোবাইলের স্ক্রিন। ধ্রুব তো মেসেজে লিখেই বসল, 'গাধা! সবকিছু পণ্ড করে দিবি নাকি তুই? এখনো আসছিস না যে? কারও কলও

ধরছিস না।'

ঠিক, শাওন আজ সবকিছু পণ্ডই করে দেবে। এতোদিনকার চলে আসা সব রীতি আর নীতিতে আজ ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে শাওন। তবে সেই ধ্বংসযজ্ঞের একটা জায়গায় সৃষ্টির প্রাণবন্ততা আছে, আছে প্রত্যাবর্তনের অপরিসীম আর অপার্থিব আনন্দ। শাওনের ভাবনাজুড়ে যে সুর বারে বারে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যে শৈশব স্মৃতির পাতা থেকে আজ ভীষণভাবে উঠে আসতে চাইছে—শাওন আজ তাতে কোনো বাধা দেবে না।

খুব করে মায়ের কথা মনে পড়ছে শাওনের। এতোগুলো দিন কতভাবে যে তাকে কষ্ট দিয়ে এসেছে সে—তা ভাবতেই নিজেকে ভারি অপরাধী মনে হচ্ছে তার। আজ সকালেও তো কেমন নির্দয়ভাবে শাসালো মা'কে। কিন্তু কী অদ্ভুত, মা একবারের জন্যও কোনো প্রতিবাদ করলো না, একবার রেগে উঠলো না পর্যন্ত! তার বদলে প্রতিবারই কেবল মুখ গুঁজে কেঁদেছে, নয়তো উদাস নয়নে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছে—ভাবে শাওন। আমাকে পেটে ধরে মা কি বড় কোনো অপরাধ করে ফেলেছে? স্বামীকে হারিয়ে সন্তান বুকে আঁকড়ে ধরে জীবনটা কাটাতে চেয়েছিল মা—এই কি তার অমার্জনীয় অপরাধ?

শাওনের চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু ঝরতে থাকে। এই খোলা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে মামুনের মতো করে হাউমাউ করে তার কাঁদতে ইচ্ছে করছে। সে দু-হাতে মুখ চেপে ধরে গোঙাতে থাকে।

[চার]

ঠক... ঠক... ঠক...

বড্ড অসময়ে আজ রাহেলা বেগমের দরজায় কড়া নড়লো। দরজা খুলে সামনে শাওনকে দেখে তিনি বেশ ঘাবড়ে গেলেন। এই অসময়ে কোনোদিন তো ও বাড়ি ফেরে না। তবে আজ কেন? তবে কি ওর শরীর খারাপ করেছে? নাকি ক্যাম্পাসে কোনো ঝামেলা হয়েছে তাকে নিয়ে? রাহেলা বেগমের বুকের ভেতরটা ধড়ফড়াতে শুরু করেছে।

শাওন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো মায়ের দিকে। পলকহীন সেই তাকানোতে তাচ্ছিল্য নেই, উদাসীনতা নেই, নেই অপমান-অপদস্থ করবার কোনো উপকরণ। রাহেলা

বেগমের বুকের ধড়ফড়ানি বাড়তে থাকে। ছেলের সম্ভাব্য বিপদের ফিরিস্তি তার চোখের সামনে যেন নৃত্য শুরু করে দিয়েছে।

এবার যেন বজ্রাঘাত হলো এবং সেই আঘাতে ভেঙেচুরে গেলো এতোক্ষণের সমস্ত নাটকীয়তা। শাওন এবার সত্যিই হাউমাউ করে কেঁদে রাহেলা বেগমের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো। আকস্মিক এই নাটকীয় দৃশ্যের কোনোকিছু বুঝে উঠবার আগেই শাওন কান্না-বিজড়িত গলায় বলতে শুরু করে, 'আমাকে মাফ করে দাও মা। তোমার সাথে আমি অনেক অন্যায় করেছি। আমি আর তোমার অবাধ্য হতে চাই না, আর তোমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত করতে চাই না নিজেকে। তুমি আমাকে আগের মতো বুকে টেনে নাও মা, প্লিজ।'

রাহেলা বেগমের বুকের ছটফটানি কমে আসে। গলা জড়িয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকা শাওনের গালে চুমু খান তিনি। শাওনের এই বোধোদয়ের জন্যই যে তার এতোদিনের অপেক্ষা! একপ্রকার হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে পুনরায় ফিরে পেয়েছেন তিনি। রাহেলা বেগমের ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে জায়নামায বিছিয়ে দুআ করতে। এমন মুহূর্তকে সামনে নিয়ে হাজার বছর যে শান্তিতে বেঁচে থাকা যায়!

বাবাদের গল্প

[এক]

ক্লাসে রীতিমতো একটা যুদ্ধ লেগে গেছে। বিশ্বকাপ ফুটবলের সময়গুলোতে বাংলার ক্লাসরুম, চায়ের দোকান, লাইব্রেরি থেকে শুরু করে পাড়ার ঘরে ঘরে একটা যুদ্ধের আবহ বিরাজ করে। সমর্থিত দল, তাদের খেলোয়াড় এবং খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স, বিগত বছরগুলোতে দলের অর্জন, ফুটবল ইতিহাসে দলগুলোর ঝুলিতে কী আছে আর কী নেই তার চুলচেরা হিসেব-নিকেশ করার কাজে বাঙালির চাইতে বেশি পারদর্শী জাতি এই মহাবিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই।

ক্লাশরুমের যুদ্ধটারও চিরচেনা বিষয়বস্তু—'ব্রাজিল বনাম আর্জেন্টিনা।' তর্ক-বিতর্ক হলে তো তাও ঠিক ছিলো, এসব যুদ্ধ ঠাট্টা, মশকারি থেকে শুরু করে একেবারে হাতাহাতি, এমনকি ধস্তাধস্তি পর্যন্ত গড়ায়। ক্লাসে এই মুহূর্তে হচ্ছেও তা-ই। দু'পক্ষের সমর্থকদের একে-অন্যকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকারিতে পরিবেশটা খুবই বিদঘুটে হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর্জেন্টিনা সমর্থকরা তাদের দু'বার বিশ্বকাপ জয় এবং নিকট অতীতে ফাইনালিস্ট হওয়ার গল্প ফাঁদতে ব্যস্ত। অন্যদিকে ব্রাজিল সমর্থকরা নিজেদের পাঁচবারের বিশ্বকাপ ট্রফি জয়ের গল্প বলে বিগত বছরগুলোর ব্যর্থতা লুকাতে মরিয়া। কিছু আছে জার্মানি সমর্থক। এরা আকারে ইঙ্গিতে আবার আর্জেন্টিনার দিকেও ঢলে পড়ে মাঝেমধ্যে। অন্যদিকে হাতেগোনা কিছু পর্তুগাল সমর্থকরা যেন চোখমুখ

বন্ধ করে ব্রাজিলকেই তাদের 'সেকেন্ড হোম' মনে করে। এই বিতর্ক মাঠ, ক্লাস আর চায়ের আড্ডা ছাপিয়ে জন-জীবনে একটা বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে ইতোমধ্যেই।

[দুই]

কড়া রোদের মধ্যে ফারুক সাহেব অফিস থেকে ফিরছেন। বাইরের তাতানো গরমে দরদর করে ঘামছেন তিনি। মধ্যবিত্ত সংসারের ঘানি টানতে হয়, মাঝেমধ্যে কিছু পথ রিকশায় চড়ে আসতে মন চাইলেও শরীর সায় দেয় না। এ যে মধ্যবিত্তের শরীর, মরুভূমির মধ্যখানে পানির পিপাসা পেলেও এদের দু'বার ভাবতে হয়, 'ঝোলায় যে পানি মজুদ আছে, তা দিয়ে সামনের অবশিষ্ট দিনগুলো চলা যাবে তো?' যদি মনে হয় চলা যাবে, তাহলে টুক করে এক চুমুক খেয়ে কোনোভাবে পিপাসা নিবারণ করে, যদিও তাতে মুখ ভিজলে গলা ভিজে না।

ঘরে পা দিতেই ফারুক সাহেবের স্ত্রী সাজিয়ে বসেছেন অভিযোগের পসরা। ছেলের নাকি শখ জেগেছে এই মহল্লার সবচাইতে বড় পতাকা ওড়ানোর। মধ্যবিত্ত বাবার উচ্চবিত্ত-মনা সন্তান। নিজেরা যতো কষ্টই করুন, ছেলেপেলের শখ-আহ্লাদ পূরণে ঘাটতি হলে কেমন যেন একটা অপরাধবোধে ভোগেন এই শ্রেণিটা। নিজের শার্টের কলারের সুতো উঠে গেলেও, সন্তানের শখ পূরণে তারা মোটেও অসচ্ছল নন। ঋণ করে হোক কিংবা শরীরের রক্ত বেচে—সন্তান যখন কোনোকিছু চেয়েছে, দিতে তো হবেই। এই দেওয়া-নেওয়ার মাঝখানে মধ্যস্থতা করে একটা দীর্ঘশ্বাস। ফারুক সাহেব সেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোসলে ঢুকে পড়লেন।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ছেলের রুমে এসে ঢুকলেন তিনি। জানালার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে আবির, চোখ তার রাজেশদের বাড়ির ছাদে। রাজেশ জার্মানি সমর্থন করে। একটা বিশাল সাইজের জার্মানির পতাকা সারাদিন পতপত করে ওড়ে ওদের ছাদটায়। পতাকা নিয়ে রাজেশের সে কী বড়াই! ক্লাসে তর্ক-বিতর্কের মধ্যে একদিন মইনুদ্দিনের সাথে বাজি ধরে ফেলে সে। কে কার চাইতে বড় পতাকা ওড়াতে পারে। সেদিনই নাকি ওর বাবা ওকে মকবুল কাকার দোকান থেকে সবচাইতে বড় জার্মানির পতাকাটা কিনে এনে দেয়। আবির জানে, তার বাবা রাজেশের বাবার মতো নয়। 'সে বললো আর কিনে দেবে'—এমনটা কখনো হবে না। কিন্তু কেন তার বাবা এ রকম? রাজেশের বাবা, মইনুদ্দিন, সাকিব আর রানাদের বাবা তো এ রকম নয়।

ছেলের পিঠে আলতো করে হাত রাখেন ফারুক সাহেব। চমকে ওঠে আবির। পেছনে ফিরে দেখে তার বাবা দাঁড়িয়ে।

'কী ভাবছিলে?'

'কই, কিছু না তো।'

'কিছু তো ভাবা হচ্ছেই। পতাকার কথা বুঝি?'

দ্বিতীয়বার চমকে যায় আবির। বাবা কি তাহলে কোনোকিছু আঁচ করে ফেলল? কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারে সে। বলে,

'মা বলেছে?'

'হু-ম-ম। কোন পতাকাটা চাই তোমার?'

খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে আবিরের মন। এতো সহজে বাবা পতাকা কিনে দিতে রাজি হয়ে যাবে—তা তো স্বপ্নেই ভাবা যায় না। কী আবোল-তাবোল এতোক্ষণ ভাবছিল সে বাবাকে নিয়ে তা মনে পড়তে নিজেকে ধিক্কার দিতে মন চাইলো তার।

'আমার আর্জেন্টিনার সবচাইতে বড় পতাকাটা চাই, বাবা।'

'বেশ। কোথায় পাওয়া যাবে এটা?'

'মকবুল কাকার দোকানে।'

'মকবুলের দোকান? ওটা তো মুদি দোকান, ওই দোকানে পতাকা বিক্রি হয়?'

'মকবুল কাকা এখন পতাকাও বেচে বাবা। ওই দেখো, রাজেশদের ছাদে কত্তো বড়ো একটা পতাকা উড়ছে, ওটা তো মকবুল কাকার দোকান থেকেই কেনা।'

ফারুক সাহেব জানালার বাইরে দৃষ্টি ফেলে রাজেশদের ছাদে উড়তে থাকা পতাকাটার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তাই তো দেখছি! কিন্তু ওখানে যে পতাকা পাওয়া যায়, আমি তো জানতাম না।'

পিতা আর পুত্র উভয়ের দৃষ্টি ওই বিশাল সাইজের জার্মান পতাকার দিকে। রং-বেরঙের ওই পতাকায় চোখ ফেলে আবির আঁকছে এমন একখানা পতাকা

ওড়ানোর স্বপ্ন, আর ফারুক সাহেব কষছেন অনাগত মাসের খরচের খসড়া। তাকে পরের মাসেও নতুন করে ধার-দেনায় জড়াতে হবে। কার কাছে হাত পাতা যাবে সেই চিন্তায় তার মন এখন থেকেই বিপন্ন।

'বাবা', মৃদু স্বরে ডাক দেয় আবির।

'বলো, বাবা।'

'আমি কি পতাকা ওড়াবো না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই ওড়াবে।'

'তাই?'

'হুম।'

'থ্যাংকিউ, বাবা।'

[তিন]

গুনে গুনে দুই হাজার টাকা ফারুক সাহেব আবিরের হাতে দেয়। আবির খোঁজ নিয়ে এসেছে, মকবুল কাকার দোকানে যে বিশাল সাইজের আর্জেন্টিনার পতাকাটা আছে, ওটার দাম দুই হাজার। পতাকাটা এখনো পর্যন্ত কেউ কেনার সাহস করতে পারেনি। এই পতাকা আর্জেন্টিনার পতাকাগুলোর মধ্যেই যে সবচেয়ে বিশাল তা নয়, অন্য কোনো পতাকা এটার ধারে-কাছেও নেই। তার মানে—আবির যদি এই পতাকা কিনতে পারে, তাহলে সে তো আর্জেন্টিনা সমর্থকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পতাকাটা ওড়াবেই, সাথে অন্যসকল দলের মধ্যেও আবির হয়ে উঠবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এমন একটা অর্জন আবিরের হতে যাচ্ছে তা ভাবতেই আবিরের যেন চোখ দিয়ে পানি এসে যায়। কালকে ক্লাসে গিয়ে সবার সামনে বুক ফুলিয়ে সে যখন তার পতাকার গল্প করবে, তখন সকলের চেহারার যা অবস্থা হবে তা ভেবে আবিরের এখনই হেসে কুটি কুটি হতে মন চাচ্ছে।

আবির মকবুল কাকার দোকানে এসে দাঁড়ালো। অনেকগুলো ছেলে-পিলে এখানে পতাকা কিনছে। এক-দেড়শো টাকা দামের পতাকা। সেগুলো আর কতোই বা বড় হবে, বড়োজোর দুই-তিন হাত। কিন্তু আবির যেটা কিনতে এসেছে সেটাই হলো দেখার মতো পতাকা! সাড়ে বিয়াল্লিশ হাত লম্বা এই পতাকা যখন বুকের সাথে

জড়িয়ে ধরে ঘরে ফিরবে আবির, রাস্তার সবাই নিশ্চয় বড় বড় চোখ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকবে।

আবির সন্তর্পণে আরও ঘনিষ্ঠ জায়গায় এসে দাঁড়ায়, যেখান থেকে মকবুল কাকার সাথে সরাসরি কথা বলা যাবে।

'মকবুল কাকা!'

ব্যস্ত দোকানি তাকানোর ফুরসত পায় না। আবির আবার ডাক দেয়, 'কাকা!'

মকবুল মিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় আবিরের দিকে, 'কী হইছে?'

'আমার পতাকা লাগবে।'

'কোন দেশ?'

'আর্জেন্টিনা।'

'দেও একশো ট্যাহা।'

'একশো টাকার পতাকা না তো। দুই হাজার টাকা যেটার দাম।'

এবার অবাক হয় মকবুল মিয়া। কপালের ভাঁজ আরও দীর্ঘ করে বলে, 'দুই হাজার ট্যাহা আছে তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ, এই যে দেখো', বলতে বলতে আবির পকেট থেকে চারটে চকচকে পাঁচশো টাকার নোট বের করে দেখায়।

মকবুল মিয়া কোনোকিছু না বলে, একবার আবিরকে আগাগোড়া দেখে নেয় আগে। তারপর বলে, 'তুমি ফারুকের পোলা না?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার বাপে কই?'

'বাবা ঘরে।'

'তোমার বাপে জানে তুমি দুই হাজার ট্যাহা দামের পতাকা কিনতে আইছো?'

'বাবাই তো দিলো টাকা।'

'বাপে দিছে? তোমার বাপে যে আমার দোকান থেইকা বাকিতে জিনিস-পাতি নিয়্যা যায়, সেই ট্যাহা দেওনের খবর নাই, পোলারে দুই হাজার ট্যাহা দিয়া পতাকা কিনতে পাঠায়!'

কথাগুলো শুনে আবির মাথা নিচু করে ফেলে। ওর আশপাশের সবাই ওর দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, যা ওকে খুব আহত করছে। ওর কান্না করে দিতে ইচ্ছে করছে এখন। কিন্তু এতোগুলো মানুষের সামনে ও কীভাবে কান্না করবে? কোনোমতে চোখের জল আটকে রাখে আবির।

মকবুল মিয়া আরও বলে, 'গত মাসে হাতের ঘড়ি বন্ধক রাইখা গেছে আমার কাছে। ট্যাহা দেওনের কথা আছিলো, দিতে পারে নাই। ওই ঘড়ি দিয়া আমি কি পানি খামু? তোমার বাপেরে কইবা এসব ফুটানি বাদ দিয়া যেন আমার ট্যাহা দিয়া যায়।'

'কতো টাকা পাওনা আছে আমার বাবার কাছে?', আবির কোনোমতে প্রশ্ন করে।

একটা পুরাতন খাতা খুলে মকবুল মিয়া তাতে চোখ বুলায়। কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে ওঠে, 'গুইনা গুইনা আড়াই হাজার ট্যাহা পামু।' একটা ড্রয়ার টান দিয়ে খুলে, তার ভেতর থেকে বের করে একটা ঘড়ি। এই ঘড়ি আবির চেনে। তার বাবার ঘড়ি এটা। বাবাকে সব সময় পরতে দেখে সে। কিন্তু এই ঘড়ি যে বাবা কখন এখানে বন্ধক রেখে গেছে তা আবির জানে না। বাবার হাতের দিকে কখনো সে ওভাবে নজর দেয়নি হয়তো, তাই বুঝতে পারেনি।

ঘড়িটা হাতে নিয়ে মকবুল বলে, 'এই দেখো, এই ঘড়ি রাইখা গেছে তোমার বাপে। কও তো, এই ঘড়ি বেচলে কি আড়াই হাজার ট্যাহা পাওয়া যাইব?'

আবির কিছু বলে না। উপস্থিত পাড়ার অন্য ছেলেদের সামনে অপমানিত হয়ে সে যেন একখানা পাথরে পরিণত হয়েছে। যদি একদৌড়ে এখান থেকে পালানো যেতো, যদি আর কোনোদিন, কোনোদিন এই তল্লাটের, এই মকবুল কাকার দোকানের আশপাশে তার না আসতে হতো, যদি সে নিজেকে লুকোতে পারতো উপস্থিত এই ছেলেদের শ্লেষ-ভরা দৃষ্টি থেকে, তাহলে কতোই না সুন্দর হতে পারতো পৃথিবীটা!

হাতে থাকা টাকাগুলো আবির মকবুল কাকার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'কাকা, আমার পতাকা চাই না। বাবা তোমার কাছে দেনায় আটকা আছে, এই টাকা দেনা-পরিশোধ হিশেবে রেখে দাও।'

[চার]

ফারুক সাহেব ছাদের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন। দৃষ্টি অদূর পানে। দূরে কতোগুলো পাখি উড়ে যাচ্ছে। শরতের আকাশে ছুটোছুটি করছে কয়েক টুকরো মেঘ। বাড়িগুলোর ছাদে ছাদে উড়ছে রং-বেরঙের বাহারি পতাকা। এখন পতাকার মৌসুম।

ফারুক সাহেবের কাঁধে একটি কোমল হাতের, পরিচিত স্পর্শ। তিনি ঘুরে দাঁড়ান। হাতে সুতো আর পাশে দাঁড় করানো বাঁশের একটা লম্বা কঞ্চি। ছেলে পতাকা আনলে বাপ-বেটা মিলে তা ওতে বেঁধে আকাশে ওড়ানোর যাবতীয় প্রস্তুতি। কিন্তু আবিরের হাতে পতাকা নেই।

'পতাকা আনলে না?', প্রশ্ন করে ফারুক সাহেব।

আবির আর বাঁধ মানাতে পারলো না চোখের জলকে। বাবার বুকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে সে। ফারুক সাহেবের চোখও থেমে নেই। নোনা জলের একটা স্রোত, চোখ বেয়ে নেমে ভিজিয়ে দিচ্ছে আবিরের শাদা শার্ট। বাবা-ছেলের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে গোটা পরিবেশ। বোধোদয়ের এমন সুন্দর মুহূর্তে পরিবেশ কিছুটা ভারী থাকলে মন্দ কী?

টু-লেট

[এক]

বিধ্বস্ত শরীরখানা নিয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে শফিক ভাবছে, যদি আজকের রাতটা না কাটতো। যদি শেষ না হতো এই নিগূঢ় অন্ধকার, কতোই না ভালো লাগত তার। এমন নয় যে সে অন্ধকার পছন্দ করে। খুব ছোটোবেলা থেকেই তার অন্ধকার-ভীতি প্রকট। কিন্তু আজকের অন্ধকারটা ভয়ের নয়, যেন শান্তির। যেন এই অন্ধকার রাত দীর্ঘ হলেই শফিক সুখী হয়।

শফিকের দীর্ঘ বেকার-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে কাল। পানি-কলের চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ার পর অনেক লম্বা একটা সময় তার কপালে আর কোনো চাকরি জোটেনি। এই অনেকদিন পর, অনেকদিন বললে তো কমই বলা হয়, বলা উচিত অনেক বছর পরে সে নতুন একটা চাকরি পেলো বলে। এতোগুলো বছর পরে নতুন চাকরি হাতে পেয়ে শফিকের উৎফুল্ল হওয়াই উচিত ছিলো; কিন্তু সে জানে—রাত পেরুলেই তাকে পরিবার-পরিজন ছেড়ে পাড়ি জমাতে হবে সেই সুদূর ঢাকায়। স্ত্রী রেহানা, একটামাত্র মেয়ে আফরোজা আর বৃদ্ধ মা-বাবাকে ছেড়ে কীভাবে যে দিনগুলো কাটবে—সেই চিন্তায় সারাটা রাত ঘুমোতে পারেনি সে। নতুন চাকরি, তাও আবার ঢাকার বুকে, যেখানে একটা পদের জন্য হা করে থাকে হাজারটা মুখ, সতৃষ্ণ দৃষ্টি রেখে অপেক্ষায় থাকে হাজারখানেক চোখ। চাকরির জন্য চাতক পাখির মতন উদগ্রীব হয়ে থাকা এমন মানুষদের ভিড়ে, কখন শফিক নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে, আর কখন পরিবার নিয়ে থিতু হতে পারবে শহরের বুকে

তা সে জানে না। মফস্বল থেকে উঠে আসা এক নিতান্ত সরল যুবকের জন্য যেখানে টিকে থাকাটাই দুষ্কর, সেখানে ঘর-বাঁধার স্বপ্ন দেখাটা খানিকটা বিলাসিতাই বটে।

শফিকের ঘুম আসছে না কোনোভাবেই। মেয়েটার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে সে। সৌম্য-শান্ত আর পবিত্র চেহারার মেয়েটা কী এক নিবিড় ঘুমে আচ্ছন্ন! শফিক আলতোভাবে আফরোজার গায়ে হাত বুলায়, নিবিষ্টভাবে বুজে থাকা চোখের পাতা দু-খানায় চুমু খায় বারবার। আফরোজাকে ছাড়া কতোগুলো দিন তাকে থাকতে হবে তা ভাবতেই ধড়াস ধড়াস করে ওঠে তার হৃৎপিণ্ড। এই বিচ্ছেদ-ব্যথা সইবার জন্যে এখনই শফিক প্রস্তুত নয়।

বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে মায়ের চেহারাটা। রুগ্ণ শরীর নিয়ে প্রতিদিন দরজার কাছে শফিকের আগমনের পথ চেয়ে বসে থাকতো যে মহিলা, কাল হতে তার ছুটি। ছুটি বাবারও। ছেলের ফিরতে দেরি হলে, ভগ্ন শরীর সমেত মোড়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার অলিখিত যে দায়িত্ব তিনি বহুবছর ধরে পালন করে চলেছেন—কাল তার আশু-সমাপ্তি।

আর, স্ত্রী রেহানা, যাকে হৃদয়-উজাড় করে ভালোবাসে শফিক, যার সাথে কেটে গেছে তার অযুত-রাত্রি নিযুত-প্রহর, তাকে ছাড়া শফিক বাঁচতে পারবে? ভালোবাসা, রাগ আর অভিমানের এই সংসারে রেহানার সাথেই তো তার নিত্য-বোঝাপড়া, তাকে রেখে একটা আলাদা জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার কথা ভাবতে গেলেই তার বুক ফেটে কান্না আসে। কাঁদে সে ঠিকই, বিরহের দহনে বুকের ভেতরটা লন্ডভন্ড প্রায়, কিন্তু বাইরে তার প্রদর্শনী চলে না। পুরুষ মানুষ, শক্ত মনের হবে—জগতের নিয়ম কিনা!

[দুই]

'আপনার নাম শফিক?', সামনে উপবিষ্ট ভদ্রলোকের প্রথম প্রশ্ন।

'জি', ঘাড় কাত করে উত্তর দিলো শফিক।

'চেয়ারে বসুন। আপনার ব্যাপারে ম্যানেজার সাহেব আমাকে বিস্তারিত বলেছেন।'

নীল শার্ট পরা লোকটা কথাগুলো বলতে বলতে ডেস্কের ওপর থাকা কাগজের স্তূপ থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে মুখের সামনে ধরলেন। শফিকের বুঝতে

বাকি নেই যে, এটা ওরই সিভি। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাগজখানার ওপর সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে লোকটা বললেন, 'আপনার সিভি দেখে এর আগে আপনি সাপ্লাই চেইনের কোনো কাজ করেছেন বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'জি না।'

'তাহলে তো বেশ খাটতে হবে শফিক সাহেব।'

'তা আমি পারবো।'

'বেশ! আপনাকে উত্তর-জোনে কাজ করতে হবে। আপনি আমাদের উত্তর-জোনের ম্যানেজার বিপুলের অধীনে কাজ করবেন আপাতত। আপনার পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে আমরা আপনার পরবর্তী পজিশানের ব্যাপারে চিন্তা করবো। টিল দেন, গুড লাক।'

'জি, ধন্যবাদ স্যার।'

অফিস থেকে বের হয়ে শফিক আকাশের দিকে তাকায়। এই শহরের দালানগুলোর চূড়া দেখতে হলে ঘাড় অনেকখানি কাত করা লাগে। ইট-পাথরের ইমারতে ভরা এই নতুন শহরে, জীবিকার তাগিদে ছুটে আসা হাজারো মানুষের ভিড়ে মিশে যায় শফিক। চেহারা ভিন্ন হলেও, সবার যেন অভিন্ন আত্মা, অভিন্ন অভিপ্রায়।

[তিন]

মাত্র তিন মাসের মাথায় শফিকের পদোন্নতি হয়। অন্যের অধীনে উত্তর-জোনে কাজে ঢুকেছিল, এখন সে নিজেই উত্তর-জোনের ম্যানেজার। বেতন আর ভাতাও বেড়েছে ভালো রকমের। বাড়ি থেকে ফেরার আগের রাতে শফিক আকাশের দিকে তাকিয়ে যে বিলাসিতাময় স্বপ্ন এঁকেছিল, এতো তাড়াতাড়ি তার নাগাল পাওয়া যাবে তা অকল্পনীয় ছিলো শফিকের কাছে। আগামীকাল ভোরের ট্রেনে চেপে গ্রাম থেকে শফিকের পরিবার ঢাকায় আসছে। নতুন একটা বাসাও ভাড়া নিয়েছে সে। ঢাকা থেকে খানিকটা দূরে, একটা একতলা পুরোনো বাড়ি! অল্পের মধ্যেই পাওয়া গেছে বলতে হবে। বাড়ির সামনে একফালি উঠোনও আছে, যেখানে আফরোজা সারা দিনমান খেলতে পারবে। শফিকের রুমের জানলার সাথে লাগোয়া একটা কচি পেয়ারা গাছ। ভোরের আলো পড়লে গাছের পাতাগুলো যেন আরও ঘন সবুজ হয়ে

ওঠে। সব মিলিয়ে শফিকের মনের মতো একটা জায়গা হয়েছে এটা। ঢাকাও নয়, আবার ঢাকা থেকে দূরেও নয়।

আজ রাতেও শফিকের চোখে ঘুম নেই। বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে শুধু। আনন্দে আত্মহারা তার তনু-মন। কী আশ্চর্য! সেদিনের সেই রাত দীর্ঘ হলেই যেন বেঁচে যেতো শফিক। আর আজ একেবারে ভিন্ন ব্যাপার। ইচ্ছে করছে ভোরটাকে টেনে নিয়ে আসতে। এতো দীর্ঘ রাতও হয়?

[চার]

বেশ ভালোমতোই কাটছিল দিনগুলো। আফরোজার জন্যে স্কুল খোঁজারও তোড়জোড় শুরু হয়েছে। বাবা-মা আর স্ত্রী-সন্তান নিয়ে একটা সুখের সংসার গড়ে উঠেছে শফিকের, যে সংসারের স্বপ্ন বুকে চেপে সে ঢাকা শহরে পা দিয়েছিল। এই শহর তাকে এতো তাড়াতাড়ি আপন করে নেবে তা ছিলো শফিকের ভাবনারও অতীত।

এরই মাঝে পৃথিবীজুড়ে একটা গোলমাল শুরু হলো। এটাকে বিশ্বযুদ্ধ না বলে তারচাইতেও গুরুতর কোনো নামে অবহিত করা যায়। পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ চীনে আবির্ভাব হয়েছে এক নতুন ভাইরাসের। কতো ভাইরাসই তো প্রকৃতিজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কিন্তু এই ভাইরাস সেরকম নয়। দুনিয়াজুড়ে মহামারি বাধিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন এই অনুজীব হা-রে রে-রে করে তেড়ে এলো পৃথিবীর মানুষগুলোর দিকে। অচল হয়ে পড়লো গোটা দুনিয়া। থমকে গেলো প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরা পৃথিবী। চার দেয়ালের মাঝে বন্দী হয়ে পড়লো মানব-সভ্যতা।

গোটা দুনিয়া যখন গুটিয়ে এলো, সেই তালিকা থেকে বাদ যায়নি ঢাকাও। বন্ধ হয়ে গেলো একে একে সবকিছু, এবং বন্ধ হয়ে গেলো শফিকদের কাজও। বিদেশ থেকে সাপ্লাই আসা বন্ধ। সাপ্লাই না থাকলে কাজ থাকবে কোত্থেকে? কবে সবকিছু স্বাভাবিক হবে সে ব্যাপারে কেউ কিছুই জানে না। এক ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে যেন থমকে গেলো শফিকের ভরপুর আনন্দের ঢাকাস্থ জীবনটাও।

একদিন অফিসের ম্যানেজারের ফোন এলো শফিকের কাছে। এই অনেকদিন পর অফিসের কোনো কর্তাব্যক্তির ফোন পেলো শফিক। যেন আনন্দে নেচে ওঠে শফিকের মন। তার মানে কাজ শুরু হতে যাচ্ছে আবারও। জীবনের ছন্দে ফিরে

যাওয়ার কামনায় অস্থির শফিক ফোন তুলতেই ও'প্রান্ত থেকে একটা মোটা স্বর ভেসে এলো।

'শফিক সাহেব বলছেন?'

'জি স্যার।'

'ভালো আছেন?'

'জি স্যার, ভালো।'

নীরবতা নেমে আসে দুজনের মাঝে। কারও মুখে কোনো কথা নেই আর। শফিক কান পেতে আছে একটা আকাঙ্ক্ষিত সু-খবরের আশায়। একটু বাদে, ও'পাশের মোটা কণ্ঠস্বর-অধিকারী ব্যক্তি বললেন, 'আপনাকে একটা কথা বলতে হচ্ছে শফিক সাহেব। কিছু মনে করবেন না। আমরা তো সাপ্লাই বেইজড প্রতিষ্ঠান। একটা সমস্যায় পড়ে গেছি তা বুঝতে পারছেন। কবে নাগাদ এই সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে বলতে পারছি না ঠিক। আর, এদিকে কোনো কাজ না উঠে এলে এতোগুলো কর্মীর বেতন চালিয়ে যাওয়াটাও আমাদের জন্য একপ্রকার দুঃসাধ্য। তাই অফিস থেকে কিছু কর্মীকে ছাটাই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুঃখজনকভাবে, আপনাকে আমরা আর চাকরিতে রাখতে পারছি না। সরি ফর দ্যাট। মাস তো প্রায় শেষ হতেই চলল। এই মাসের বেতন আপনার ব্যাংকে আমরা পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, শফিক সাহেব?'

একেবারে এক-নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন ভদ্রলোক। শফিক কেবল শুনে গেছে। এমন অবস্থায় কী আর বলবে সে? পায়ের নিচ থেকে বালি সরে গিয়ে যে অতল-গর্ত তৈরি হয়—শফিকের মনে হলো সে এমন কোনো গর্তে নিমজ্জিত হচ্ছে ধীরে ধীরে।

[পাঁচ]

ঢাকা থেকে খানিকটা দূরে, একতলা একটা পুরোনো বাসা। বাসার সামনে একফালি উঠোন যেখানে আফরোজা ধুলোয় মাখামাখি হতো সারাদিন। হর্ন বাজাতে বাজাতে একটা পিক-আপ এসে দাঁড়াল বাসাটার সামনে। আস্তে আস্তে ঘরের সমস্ত আবসবাবপত্র উঠে গেলো সেই পিক-আপে। বাইরে বেরিয়ে এলো রেহানা,

আফরোজা আর শফিকের বাবা-মা। বাইরে বেরিয়ে এলো শফিকও। শফিকের চোখ আটকালো এক জায়গায়। কোন ফাঁকে বাড়ি-অলা এসে তার ঘরের ওপরে যে TO-LET লাগিয়ে গেছে সে টেরও পায়নি। ঝুলন্ত সেই TO-LET বোর্ড যেন অদূরে তাকিয়ে আছে নতুন কোনো শফিকের আশায়, যে একবুক স্বপ্ন নিয়ে ঢাকায় পা রাখার প্রহর গুনছে।

মহীয়সী

[এক]

কোনোভাবেই ঘুম আসছে না চোখে। ঘরময় পায়চারি করতে করতে হোসেন যখন শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে দিতে এলো, তখন মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। গোটা তল্লাট মরণ-ঘুমে আচ্ছন্ন। হেমন্তের দীর্ঘ রাত, দৃষ্টির অনুকূলে কুয়াশার ঘন আবরণ ব্যতীত আর কোনোকিছুই দৃশ্যমান নয়। নিবিড় নিস্তব্ধতার এই নৈশপ্রহরে বহুদূর থেকে ভেসে আসা কয়েকটা খাকি শেয়ালের অস্পষ্ট হাঁকডাক ছাড়া তামাম ধরণিই থমথমে হয়ে আছে যেন।

খাটের সাথে লাগোয়া জানলাটা খুলে দেয় হোসেন। জানলা খুলবার সাথে সাথে বরফ-জমা বাতাস হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে তার বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। বাইরে নিশ্চুপ অন্ধকার। সেই অন্ধকারে দৃষ্টি ফেললে দৃষ্টি ফেরত আসে—এমন নিবিড় আর ঘন তার আস্তরণ। হোসেন ধপ করে জানলাটা আটকে দিয়ে খাটের ওপর এসে বসে। চোখে তার একফোঁটা ঘুম নেই। আগামীকাল যে ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, তার আনন্দের আতিশয্যে হোসেন আত্মহারা প্রায়।

এবারে মনে হচ্ছে কিছু একটা হবে। ঢাকা শহরের নামকরা এক সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে তার ডাক এসেছে। এমন একটা জায়গায় যদি কাজ জুটে যায়, হোসেনের জীবন থেকে দীর্ঘদিনের বেকারত্বের অভিশাপ বিদায় নেবে। আর তা ছাড়া, মিডিয়ায় কাজ করাটাও হোসেনের বহুদিনের লালিত স্বপ্ন। স্বপ্ন আর সামর্থ্যের সম্মিলিত যোগসাজশ হোসেনের জীবনে খুব একটা ঘটেনি।

দিন কয়েক আগে এক অদ্ভুত মানুষের সাথে দেখা হয় হোসেনের। মানুষটাকে আশেপাশের কোনো এলাকার বলে চিহ্নিত করা গেলো না। হতে পারে দূরের কোনো এক জেলা থেকে নিতান্তই পথ ভুল করে এদিকে চলে এসেছেন। কিন্তু মানুষটার ধারণা সে এই পৃথিবীর কোনো জীব নয়, অন্য কোনো গ্রহ থেকে দুর্ঘটনাক্রমে এই গ্রহে ছিটকে আসা কোনো এক হতভাগা! সবাই তাকে পাগল ভেবে হাসি-তামাশা করে বিদেয় হলেও, ঘটনাটায় হোসেনের ভারি আগ্রহ জন্মালো। লোকজন সরে গেলে সে মানুষটার আরও কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার হাবভাব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। লোকটাকে দেখে তার দাবির সত্যতা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ করবার অবকাশ থাকে। মুখে চাপা দাড়ি, গায়ে পাঞ্জাবি-পায়জামা, উস্কোখুস্কো চুল এবং পথভারে ক্লান্ত চেহারা—এসবের কোনোটাই ভিনগ্রহী বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। তবুও হোসেন সরে যায় না, লোকটার প্রতি তার একটা অন্যরকম মায়া জন্মায়।

লোকটা বিড়বিড় করে বলে, 'উহ, এই সূর্যের আলো এমন কটকটে কেন? আমাদের দুনিয়ার সূর্যের আলো কতো মোলায়েম আর স্নিগ্ধ! আজলা ভরে নিয়ে ওই আলো পান করা যায়, ওই আলোতে ডুব দেওয়া যায়। আমাদের সূর্যটা কতো সুন্দর, কিন্তু এই সূর্যটা এতো বিতিকিচ্ছিরি কেন?'

হোসেন হাসলো। হাসার মতোই ব্যাপার! এমন ভারি অদ্ভুত কথা হোসেন আগে কোনোদিন শোনেনি। একবার মনে হলো, লোকটার কাছে কিছু জানতে চাইলে কেমন হয়? কিন্তু সে খেয়াল করেছিলো লোকটা কারও সাথে কথা বলে না, কারও কথার কোনো উত্তর দেয় না, কেবল নিজে নিজে বিড়বিড় করে।

বিকেল গড়াতেই পৌরসভা থেকে একটা গাড়ি এসে লোকটাকে তুলে নিয়ে গেলো। লোকটার ঠিকানা পাওয়া গেছে বলে জানা যায় এবং আরও জানা যায়, লোকটা একইসাথে মানসিক ভারসাম্যহীন, ইনসমনিয়ার রোগী। সারারাত জেগে থাকে, আবোল-তাবোল বকে আর সারাদিন মোষের মতো ঘুমায়।

ঘটনাটা দাগ কেটেছিল হোসেনের মনে, বিশেষ করে লোকটার অদ্ভুত কথাগুলো। আগে থেকে তার টুকটাক লেখাজোখার অভ্যেশ ছিলো, অদ্ভুত লোকটার অদ্ভুত ঘটনাকে নিয়ে একটা গল্প লিখে ফেলবার ঝোঁক তার মনে প্রবল হয়ে উঠলো তাই।

সে রাতে ফিরেই হোসেন খাতা নিয়ে বসে পড়লো। ধীরে ধীরে লিখে চললো এক অতি অলৌকিক গল্প। বাস্তবের লোকটা যদিও মানসিক এবং ইনসমোনিয়ার

রোগী বলে জানা গিয়েছিলো, কিন্তু হোসেন গল্পটাকে চিত্রায়িত করলো একেবারে ভিন্নভাবে। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে লোকটা নিজেকে অন্যগ্রহের বলে দাবি করছিলো বারবার। হোসেনও গল্পের কাহিনিকে সেদিকে প্রবাহিত করলো। গল্পের উপজীব্য একটা প্রাণী যে দেখতে হুবহু মানুষের মতো হলেও, সে আদতে মনুষ্য-গ্রহের কোনো জীব নয়। তার আবাসস্থল মহাশূন্যের নীহারিকা, গ্রহপঞ্জি, তারকালোক ছাড়িয়ে ভিনগ্রহের কোনো এক ভূতুড়ে জগতে। সেখানকার বাস-পদ্ধতির কোনো এক ত্রুটির কারণে তাকে ছিটকে পড়তে হয় দোপেয়ে মানুষদের এই গ্রহে। কিন্তু সেই ভূতুড়ে গ্রহের প্রাণীটা কীভাবে মানুষের মতো কথা বলছে, কীভাবে মানুষের মতোই তার হাবভাব, গড়ন-গাড়ন সে এক বিরাট রহস্য! সেই রহস্যের মায়াজাল ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলে হোসেনের গল্প।

ভিনগ্রহী আগন্তুক শিরোনামের যে গল্পটা হোসেন লিখলো, তার সকলরব প্রশংসা করলো বন্ধুমহল। আলমগীর বললো, 'তুই একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছিস বন্ধু! দীর্ঘদিন পর এতো ভালো একটা গল্প পড়লাম। ইমপ্রেসিভ!'

শাওনের মুখে লাগামের বালাই থাকে না। কথা বলতে দিলেই ওর মুখে খই ফোটে। হোসেনের গল্প পড়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে অসংযত শাওনও নিজেকে বেশ সংযত করে বললো, 'তুই শালা তো রাতারাতি তারকা বনে যাবি রে হোসেন! কী গল্পটাই না লিখেছিস তুই! সত্যি বলছি।'

মুখরা সমালোচক হিশেবে পরিচিত আড্ডার সাহিত্য-বান্ধব বন্ধু মিজানের মুখেও হোসেনের প্রশংসা-কীর্তন! মিজান বললো, 'হোসেন, দারুণ একটা গল্প হয়েছে এটা। আমি একটা পরামর্শ দিই, এটাকে তুই ঢাকার সাপ্তাহিক কোনো কাগজে পাঠিয়ে দে। আমি নিশ্চিত ওরা অনায়েশে ছাপিয়ে দেবে। ভাগ্য ভালো থাকলে সেলামিও পেতে পারিস।'

মিজানের পরামর্শটা মনে ধরলেও, মুখে একপ্রকার উড়িয়েই দিয়েছিলো হোসেন। বলেছিলো, 'ধুর, কী সব যে বলিস তোরা! এটা আহামরি কিছুই হয়নি। আসলে ওই অদ্ভুত লোকটা থেকে এই গল্পের মূল উপাদান এসেছে বলেই তোদের কাছে গল্পটাকে ভালো লাগছে। পেছনের গল্পটা না জানলে এটা পড়তে পড়তে তোদের হাই উঠে যেতো। কিন্তু তাই বলে ঢাকাইয়া কাগজে লেখা পাঠিয়ে মান-ইজ্জত খোয়াবো, এমন আহাম্মক আমি নই।'

হোসেনের কথা শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠলো শাওন। সে নিজে কখনো সোজা কথার সোজা জবাব না দিলেও, অন্যজনের বাঁকা কথা সহ্য করতে সে একদম অনাগ্রহী। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সে বললো, 'হয়েছে জ্বালা! একটুখানি প্রশংসা পেলো, আর এখন এমন অভিনয় করছেন যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে না জানবার মতোই কচি খোকা তিনি।'

শাওনের অগ্নিবাণ নিক্ষেপে হস্তক্ষেপ করে মিজান আবার বলে উঠলো, 'আমার পরিচিত এক কাকা আছেন ঢাকায়। ভালো একটা প্রেসে কাজ করেন। শেষবার ঢাকা থেকে কাকার সাথে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নয়াদিন'-এর অফিসে গিয়েছিলাম। বেশ খাতির-যত্ন পেয়েছিলাম সেদিন আমরা। আমার ধারণা, কাকাকে বলা গেলে কাকা তোমার গল্পটা ছাপাবার একটা বন্দোবস্ত করে দিতে পারবেন।'

শাওনের স্পষ্ট গলা, 'এতো ভালো গল্পটার জন্য কাকা-চাচার কাছে ধরনা দিতে হবে কেন? ওই পত্রিকার ঠিকানায় আমরা গল্পটা পাঠিয়ে দেখি। ভালো লাগলে ওরা ছাপাবে। ভালো না লাগলে বাদ। অন্য কোথাও দেওয়া যাবে তখন।'

নীরস স্পষ্টবাদী এবং লাগামহীন মুখের অধিকারী হলেও কথাটা খারাপ বলেনি শাওন। আর তা ছাড়া, অন্য কারও সহায়তায় নিজের যোগ্যতা প্রমাণে বাহাদুরি নেই—এ কথা হোসেন জানে। সকলের মতামতও তা-ই, আগে গল্পটা সাপ্তাহিক 'নয়াদিন'-এ পাঠানো হোক, যা হয় হবে।

পরদিন সকালেই ডাকযোগে হোসেনের গল্পটা ঢাকার নামকরা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নয়াদিন'-এর ঠিকানা বরাবর পাঠিয়ে দেওয়া গেলো। এরপর যাপিত জীবনের জাঁতাকলে সকলে যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

বলা নেই, কওয়া নেই একদিন হোসেনের ঠিকানায় একটা চিঠি এসে হাজির। সম্প্রতি সাপ্তাহিক নয়াদিনের সম্পাদক ব্যতীত জীবনে সে কোনোদিন কাউকে কোনো চিঠি লেখেনি। ফলে পৃথিবীতেও এমন কেউ নেই যে হোসেনকে চিঠি লিখতে পারে। নিজের লেখা নিয়ে খুব বেশি আশাবাদী ছিলো না বলেই হয়তো, নয়াদিনে যে একটা গল্প পাঠানো হয়েছিলো এবং তার প্রত্যুত্তরও যে আসতে পারে—তা বেমালুম ভুলে বসেছিলো সে।

CamScanner

চিঠি হাতে নিয়ে যারপরনাই বিস্মিত হলো হোসেন। হলুদ খামের ওপর খুব স্পষ্ট করে, গোটা গোটা অক্ষরে লেখা 'আদিত্য আদি, সম্পাদক, সাপ্তাহিক নয়াদিন।' প্রাপকের ঠিকানায় লেখা তার নাম। স্বপ্নও এতো সুন্দর আর এতো আকস্মিক হয় কি না জানে না হোসেন! এতো নামকরা একটা পত্রিকার সম্পাদক তার নামে চিঠি পাঠিয়েছে—তা যেন হোসেনের কাছে সেই মধুর স্বপ্নের মতো, চোখ খুললেই যা হাপিস হয়ে যায়। কিন্তু এই যে হোসেনের সামনে দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে একটা অটো চলে গেলো, দর্জিবাড়ির উঠোনে ঐ যে ছেলেমেয়ের দল কী এক দারুণ খেলায় হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে, মাথার ওপর দিয়ে সাঁই করে চলে গেলো যে অ্যারোপ্লেন—এ সবকিছু একযোগে কীভাবে স্বপ্ন হতে পারে!

ওটা স্বপ্ন ছিলো না। হোসেন সত্যি সত্যিই নয়াদিন সম্পাদকের চিঠি পেয়েছে। চিঠিতে যা লেখা ছিলো তা হোসেনের এক জীবনে পাওয়া সবচেয়ে সেরা প্রাপ্তি।

সুহৃদ,

আপনার 'ভিনগ্রহী আগন্তুক' গল্পটা পড়ে শেষ করলাম। বহুদিন পর চোখ ডুবিয়ে এতো দুর্দান্ত একটা রহস্য গল্প পড়া হলো। গল্পভর্তি যেমন সাসপেন্স আছে, তেমনই আছে পাঠককে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার অসম্ভব ক্ষমতা। আপনার গল্পটা 'নয়াদিন'-এর আগামী সাময়িকীতে আমরা বিশেষভাবে ছাপাতে চাই। 'নয়াদিন'-কে বেছে নেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। 'নয়াদিন'-এ নিয়মিত লিখবেন এই প্রত্যাশা। আপনার জন্যে ছোট্ট একটা উপহার পাঠানো হয়েছে। উপহারটা গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করবেন।

ধন্যবাদান্তে

আদিত্য আদি

সম্পাদক, সাপ্তাহিক নয়াদিন।

চিঠির ভেতরে অন্য একটা খামে মোড়ানো পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া গেলো। মিজানের কথা বৃথা যায়নি মোটেও। পত্রিকা-অফিস গল্পটার জন্যে ভালো অঙ্কের সেলামিও পাঠিয়ে দিয়েছে। হোসেনের মনে ঈদের দিনের মতো আনন্দ! তার ইচ্ছে করছে দর্জিবাড়ির উঠোনে খেলাধুলোয় মজে থাকা ছেলেপিলের দলে মিশে গিয়ে হেসে লুটোপুটি খেতে। আহ, জীবন মাঝে মাঝে এতো সুন্দর কেন?

মাসখানেক পর হোসেনের ঠিকানায় আরও একটা চিঠি এসে হাজির। প্রেরক আগের জনই—নয়াদিনের সম্পাদক আদিত্য আদি।

সুহৃদ,

ভালোবাসা জানবেন। আপনি জেনে পুলকিত হবেন যে, আপনার 'ভিনগ্রহী আগন্তুক' গল্পটি ইতোমধ্যেই পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে এবং তা আমাদের পাঠকদের বেশ ভালোবাসা কুড়িয়েছে। আপনার পরবর্তী গল্প পড়ার জন্য মুখিয়ে থাকা পাঠকদের অপেক্ষার প্রহর খুব বেশি দীর্ঘ হবে না□এই প্রত্যাশা। আর হ্যাঁ, আপনার যদি সময় হয় তাহলে নয়াদিন অফিসে চায়ের নিমন্ত্রণ রইলো। কোনো এক হেমন্ত-সন্ধ্যায় আমরা ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ হাতে দারুণ গল্প-আড্ডায় মেতে উঠবো।

ধন্যবাদান্তে

আদিত্য আদি

সম্পাদক, সাপ্তাহিক নয়াদিন।

হোসেন যেন এক ঘোর-লাগা সময়ের আবেষ্টনীর মাঝে বন্দী হয়ে পড়েছে। তার উদাসী, উচ্ছন্নে যাওয়া সময়গুলো এভাবে প্রাণ ফিরে পাবে, এভাবে সেগুলো চাঞ্চল্যে ভরে যাবে তা এখনো হোসেনের কাছে রূপকথার মতো মনে হয়।

হোসেনের প্রকাশ-ব্যাকুল আনন্দ ছুঁয়ে গেছে তার আড্ডার বন্ধুদেরও। ঠোঁটকাটা শাওন ব্যগ্র কণ্ঠে বললো, 'যা বলেছিলাম তা-ই হলো। হোসেন মিয়া এখন তারকা-খ্যাতির পথে আরও একধাপ আগাইয়া গেলো। নয়াদিনের সম্পাদক চিঠি লিখে চায়ের নিমন্ত্রণ দেয়! উহ, কী সৌভাগ্য তোর! বড় হয়ে আমাদের ভুলে যাসনে বন্ধু।'

হোসেন বললো, 'কিন্তু, আদিত্য আদি সাহেব কী উদ্দেশ্যে আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন তা পরিষ্কার বোঝা গেলো না। তোর কী মনে হয় মিজান?'

মিজান তার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য চেহারায় আরও প্রকট করে, শার্টের কোনা দিয়ে চশমার কাচ পরিষ্কার করতে করতে বললো, 'একদম সহজ। এরা বিনা উদ্দেশ্যে খাতির জমাতে কাউকে ডেকে নেয় না। ওদের সময়গুলোও অতো সস্তা নয়। কিছু

একটা উদ্দেশ্য তো আলবৎ আছে। আমি মনে হয় বুঝতে পারছি কিছুটা।'

মিজানের পর্যবেক্ষণের ওপরে সকলের গভীর আস্থা আছে। মিজান কোনো বিষয়ে কোনো মন্তব্য করবে, কিন্তু তার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি, যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত থাকবে না, তা কখনো হতে দেখা যায়নি। শাওন তাকে যতোই হেসে উড়িয়ে দিক, মনে মনে সকলে, এমনকি শাওনও মিজানের পর্যবেক্ষণলব্ধ উপলব্ধি এবং মতামতকে শ্রদ্ধা করে।

'বুঝতেই যখন পারছিস, পেটের ভেতরে আটকে রেখেছিস কেন? বলে ফেল না শুনি।' শশব্যস্ত হয়ে মিজানের দিকে তীক্ষ্ণ কথার বাণ ছুড়ে দিলো ধৈর্যহারা-প্রকৃতির শাওন।

শাওনের এই প্রকৃতির সাথে সবাই পরিচিত বলে ওর এমন চাঁছা-ছোলা কটাক্ষ আর তীর্যক মন্তব্যে কেউ তেমন গা করে না।

'আমার ধারণা, ওরা হোসেনকে পত্রিকার কাজে নিয়োগ দিতে চায়। হতে পারে হোসেনের অনবদ্য গল্পটা পড়ে তাদের ধারণা হয়েছে, এমন ধাঁচের গল্প যে লিখতে পারে, তাকে দিয়ে অনায়েশেই পত্রিকার ব্যাপক কাজ করানো যাবে। নয়তো একজন নবীন লেখককে এতোবড়ো একটা পত্রিকার সম্পাদক যেচে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাবেন, এটা কল্পনাতীত। এটা গুরুজী রবীন্দ্রনাথ, উস্তাদজী মুজতবা আলীর বেলাতেও ঘটেনি।' বললো মিজান।

'কাজকর্ম বলতে? কেমন ধারার কাজকর্ম?' পাশ থেকে জিগ্যেশ করলো হাবিব।

'তোরা আবার ভাবিস না যেন হোসেনকে চা আনা-নেওয়ার কাজে যোগ দিতে বলবে ওরা। প্রতিভার মূল্যায়নে এতোটা কৃপণ ওরা নয়। যোগ্য লোক পেলে ওরা মাটিতেও কামড় দেয়। কাজ বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি, এই যেমন ধর পত্রিকার জন্য ফিচার লেখা, বিশেষ সংখ্যাগুলোর জন্য গল্প লেখা, দরকার হলে মাঝেমধ্যে অন্যদের লেখায় কলম চালানো। এই আর কী!'

'তা তো বেশ ভালো কাজ তাহলে। এটা হলে আমাদের হোসেন মিয়ার তো কপাল খুলে যায়। হে হে হে।' মুখরা শাওনের পুনঃরসিকতা।

[দুই]

কাজ? নয়াদিন পত্রিকায় কাজ করবে হোসেন? যে পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করার জন্যে কতো ডাকাবুকো লেখকেরা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অপেক্ষা করে থাকে, সেই পত্রিকার একজন হয়ে উঠবে হোসেন? সত্যিই কি আদিত্য সাহেবের মনে এমন কোনো অভিপ্রায় আছে হোসেনকে ঘিরে?

এমন ঘোর-লাগা সময়ে আসলে ঘুমোনো যায় না। হোসেনেরও ঘুমোনোর তাড়া নেই। মানুষের জীবনে এ রকম রাত খুব বেশি আসে না। যখন আসে, তখন সেগুলোকে উপভোগ করে কাটাতে হয়। সময়টাকে উপভোগ করতে গিয়েই হোসেনের চোখ থেকে ঘুম পালিয়েছে।

এমন হিমধরা হেমন্ত-নিশীথে ধরণির বুকে আর কেউ বুঝি জেগে নেই একা হোসেন ছাড়া। আজ রাতে আর কারও জীবনে কী আনন্দের কোনো উপলক্ষ্য আসেনি, যা তার চোখের ঘুম কেড়ে নেবে? যা তাকে ভাসিয়ে দেবে অনাবিল আনন্দস্রোতে?

হোসেনের ভাবনায় ছেদ পড়ে। পাশের ঘর থেকে কাশির শব্দ শোনা গেলো মাত্র। গায়ে শাল জড়িয়ে হোসেন ত্রস্তপায়ে শব্দটার অকুস্থলের দিকে হেঁটে গেলো।

আলতো করে ভিজে দেওয়া ঘরের কপাট। নিস্তেজ হয়ে আসা একটা মোমের শরীর থেকে বিচ্ছুরিত মৃদু আলো ঘরটাকে রহস্যময় করে তুলেছে। ওই আলোতে এক নারী ছায়ামূর্তি হোসেনের দৃষ্টিগোচর হয়। জায়নামাযে বসে আছেন হোসেনের মা জাহানারা বেগম। হোসেন দরজায় ঠকঠক শব্দ করে দু'বার।

'হোসেন?' মৃদু গলায় জিগ্যেশ করেন জাহানারা বেগম।

'হ্যাঁ মা, আমি। তুমি জেগে আছো?'

'হ্যাঁ বাবা। ভেতরে আয়।'

হোসেন ভেতরে এলো। জাহানারা বেগম মোমবাতির প্রায় নিভে যাওয়া আগুন থেকে একটা কুপিবাতি ধরালেন। এতোক্ষণের আলো-আঁধারি ভাবটা কেটে গিয়ে ঘরময় এখন সফেদ আলোর ছড়াছড়ি।

'ঘুমাসনি কেন?', পুনরায় জিগ্যেশ করেন জাহানারা বেগম।

'ঘুম আসছিল না।'

'ভোরের ট্রেন ধরা লাগবে তা ভুলে গেলি, বাবা?'

'কই, ভুলিনি তো।'

'ভুলে না গেলে তো ঘুমানোর কথা। ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে ট্রেন ধরা যায়?'

'ও তুমি ভেবো না তো মা। ভাবছি আর ঘুমাবো না আজ। ক'টা বাজে এখন? তিনটে! রাত তো শেষ হয়ে এলো প্রায়। আর ঘুমিয়ে কাজ নেই।'

জাহানারা বেগম খাটে উঠে বসেন। হোসেন মায়ের কোলে মাথা রেখে বললো, 'জানো মা, আগামীকালের দিনটা আমার জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত একটা দিন হয়তো। ওই যে পত্রিকাটার কথা তোমায় বললাম, পুরো দেশে ওদের বেশ নামডাক। যার-তার লেখা ওরা ছাপায় না। বাঘা বাঘা লেখকেরাও ওই পত্রিকায় জায়গা পেতে হিমশিম খায়। সেই তারাই আমার লেখাটা বেশ উৎসাহের সাথে ছাপালো। শুধু কি তা-ই? ভালো অঙ্কের সম্মানি তো দিলোই, সাথে তাদের অফিসে চায়ের দাওয়াত। ভাবো তাহলে কেমন কদর পেয়েছি আমি!'

জাহানারা বেগম অস্ফুট স্বরে বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! সম্মান দেওয়ার মালিক কেবলই আল্লাহ।' তো, তুই কি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘুমোতে পারছিস না বাবা?'

'তা যা বলেছো তুমি, মা। আনন্দে আত্মহারা! হা হা হা। একদম ঠিক। আনন্দে আত্মহারা হয়ে আছি বলেই আমার চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেছে। আমার মনে হয় কি জানো, আজ রাতে পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কারও মনে আনন্দ নেই, আর কারও জীবনে আনন্দের কোনো উপলক্ষ্য নেই। পৃথিবীর সব আনন্দ, সব রং আজ কেবল আমার জন্যেই বরাদ্দ।'

ছেলের আনন্দ দেখে জাহানারা বেগমের চোখে পানি এসে যায়। বাপ-মরা ছেলেটা কতো দ্রুতই-না বড় হয়ে গেলো তার। হোসেনের বেড়ে ওঠার পেছনে জাহানারা বেগমের যে সংগ্রাম আর সংযমের গল্প আছে, সেই গল্পটা তার গল্প-লিখিয়ে ছেলে লিখবে কোনোদিন? আজ তার নাম-ডাক চারদিকে, যখন সে অনেক বড় হবে, তখন কি সে তার বুড়ো মা'কে, যে নিজের সবটা দিয়ে তাকে আগলে রেখেছিল শতো ঝড়-ঝঞ্ঝাটে, মনে রাখবে? না রাখলেও কীই বা হবে? প্রাপ্তির আশায় বাবা-মায়েরা সন্তান মানুষ করে না। বাবা-মায়ের ভালোবাসাগুলো হয় নিঃস্বার্থ,

নির্লোভ আর নির্ঝঞ্ঝাট।

ঘরে একটা চাপা স্তব্ধতা নেমে এলো। কিছুক্ষণ কারও মুখে কোনো কথা নেই। জাহানারা বেগম ছেলের মাথায় হাত বুলাচ্ছেন পরম মমতায়।

নীরবতা ভেঙে হোসেন বললো, 'আচ্ছা মা, তুমি কেন জেগে আছো এখনো?'

স্মিত হেসে জাহানারা বেগম বললেন, 'ছেলের আনন্দের দিনে মায়েরও তো আনন্দ হয়, তাই না বাবা?'

'তা হয়, কিন্তু...' জায়নামাযের দিকে তাকিয়ে হোসেন জিগ্যেশ করলো, 'তুমি এতো রাতে সালাত পড়ছিলে?'

'হ্যাঁ, তোর জন্যে দুআ করছিলাম আল্লাহর কাছে।'

'বেশ তো। কী বলছিলে আল্লাহকে?'

'বলছিলাম আগামীকাল তুই যে উদ্দেশ্যে যাচ্ছিস, তাতে যদি তোর জন্যে কল্যাণ থাকে, তবেই যেন তোর ওখানে মন টিকে। যদি তোর জন্যে কল্যাণ না থাকে, তবে তোর মনটাকে যেন আল্লাহ ওখান থেকে ফিরিয়ে দেন।'

জাহানারা বেগমের অদ্ভুতুড়ে দুআর কথা শুনে মনে মনে হাসলো হোসেন। সে ভাবে, 'আমার আবার ওখানে মন টিকবে না! কতো আরাধ্য সে জগৎ! কতো দীর্ঘ রজনী তপস্যা করলে ও জগতে ঠাঁই পাওয়া যায়! এমন স্বপ্ন আর সৌভাগ্যকে পায়ে ঠেলবে—এতোটা আহাম্মক হোসেন নয়।

[তিন]

'কাকে চাই?', দারোয়ান মতো একজন একপ্রকার তেড়ে এসে প্রশ্নটা করলো হোসেনকে।

'আমি নয়াদিনের সম্পাদক আদিত্য আদি সাহেবের সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'কী নাম?'

'মোহাম্মদ হোসেন।'

'ওই যে বেঞ্চিটা দেখছেন, চুপচাপ ওখানে গিয়ে বসে পড়ুন। ভেতর থেকে ডাক আসলে আমি বলব', শাসনের সুরেই কথাগুলো বললো লোকটা। বলে অবশ্য বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারলো না। নতুন আরেক আম-আদমির আগমন দেখে ওদিকেই ছুট লাগাতে হলো তাকে। তাকেও প্রশ্ন করলো, 'কাকে চাই?'

লোকটার কাঁচুমাচু উত্তরে সন্তুষ্ট হতে না পেরে তাকেও আগের বেঞ্চিটা দেখিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে বলা হলো।

খানিক বাদে একপ্রকার ছুটে এলো সেই লোকটা।

'আপনাদের মধ্যে হোসেন কে?'

হোসেন দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি।'

এবারে দারোয়ান লোকটার চেহারায় কোনো রূঢ়তা লক্ষ করা গেলো না; বরং তার বদলে রয়েছে সীমাহীন শ্রদ্ধা আর আনুগত্যের ছাপ। কণ্ঠেও নেই খানিক আগের সেই কাঠিন্য।

'দুঃখিত স্যার, আপনাকে এতোক্ষণ বসে থাকতে হলো। আদি স্যার আপনাকে ভেতরে নিয়ে যেতে বললেন।'

মুহূর্তের ব্যবধানে একই লোকের দু'রকম আচরণে খানিকটা ঘাবড়ে গেলো হোসেন। মানুষটার চোখেও এখন লজ্জা আর অনুশোচনার আবহ দেখা যাচ্ছে।

'কোনো সমস্যা নেই। অপেক্ষা করতে আমার ভালোই লাগে।'

জগতের কারও কারও কাছে অপেক্ষা জিনিসটা যে সত্যিই উপভোগের—তা বোঝা নয়াদিন অফিসের এই দারোয়ানের সাধ্যের বাইরে। সুতরাং, হোসেনের কথাটা তার কাছে দরকারি বিনয় এবং একপ্রকার অদরকারি ভণিতা বলেই মনে হলো। ফলে, ঠোঁটের কোণে একটা মিথ্যে হাসি আনবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার মাঝে যা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিলো তা হলো এই—হোসেনের কথায় লোকটা একটুও পুলকিত হতে পারেনি।

'আসুন আসুন, মিস্টার হোসেন। আপনার সাথে দেখা করবার জন্যে অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছি।' কথাগুলো বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এক সুদর্শন ভদ্রলোক। তার সৌম্য-শান্ত চেহারার মাঝে সত্যিকার আনন্দের ঝিলিক

দোল খাচ্ছে। তার চোখের দৃষ্টিতে ভণিতা-বিহীন অপেক্ষার অবসানের আবহ। নাহ, ভুল জায়গায় এসে পড়েনি হোসেন।

একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে হোসেন বললো, 'ধন্যবাদ।'

'কী খাবেন বলুন? চা না কফি?'

'যেকোনো একটা কিছু হলেই হবে। না হলেও সমস্যা নেই কিন্তু।'

'মাই প্লেজার! কিছু একটা তো হওয়া চাই-ই, তা নাহলে যে আমার নিমন্ত্রণপত্রের যথার্থতা বজায় থাকলো না। আমরা তো ধোঁয়া ওঠা কাপ হাতে নিয়ে আড্ডায় মেতে উঠবার শর্তে আবদ্ধ। হা হা হা।'

এতোখানি বিগলিত বিনয়ে হোসেন সত্যিই মুগ্ধ হলো। সে বসে আছে দেশের অন্যতম প্রধান সাপ্তাহিক পত্রিকা নয়াদিন সম্পাদকের সামনে। বাইরে আরও কতো মানুষ উন্মুখ হয়ে আছে তার সাথে একটু দেখা করার জন্যে। সেই মানুষটা চিঠিতে লেখা নিতান্ত অনুল্লেখযোগ্য কথাটাও মনে রেখে দিয়েছেন ভেবে যারপরনাই অভিভূত হলো হোসেন।

ফোন করে দু-কাপ কফির কথা বলে হোসেনের দিকে তাকালেন আদি সাহেব। মুখে তার সহজাত স্মিত হাসি।

'আপনাকে দেখে আমি কিন্তু বেশ অবাকই হয়েছি বলা চলে।'

তাকে দেখে অবাক হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে সেটা হোসেন বুঝতে পারলো না। তবে কী তার কোনো আচরণ খুবই অপ্রত্যাশিত ঠেকেছে আদি সাহেবের কাছে? হোসেন অস্বস্তিবোধ করছে বুঝতে পেরে আদি সাহেব বললেন, 'তেমন কিছু না। আসলে আপনার গল্পটা পড়ে আমি এতোখানি মুগ্ধ হয়েছি, আমার ধারণা ছিলো আপনি হয়তো কোনো বয়স্ক লোকটোক হবেন। কিন্তু আপনি দেখছি একেবারে তাগড়া জোয়ান! হা হা হা। আমি যতোখানি অবাক হয়েছি, খুশি হয়েছি তারচে বেশি। আমাদের আজকালকার তরুণদের লেখার মাঝে প্রাণ পাই না কেমন যেন! কেমন যেন খাপছাড়া, অগোছালো ধরনের। আর সবাই তো সম্মিলিতভাবে একই ধারার গল্প-উপন্যাস লিখবার পণ করেছে বলা যায় একপ্রকার। তরুণদের নিয়ে আমার এই নিরাশার সময়ে আপনার মতো একজন তরুণের আবির্ভাব দুঃখের গহ্বর

থেকে আমাকে অনেকটাই টেনে তুলেছে। তরুণরা এখনো যে অসাধারণত্ব উপহার দিতে পারে—মিইয়ে যাওয়া আমার সেই বিশ্বাসের পুনর্জাগরণ হলো আপনাকে দেখে।'

আজ হোসেনের বারবার বিস্মিত হবার দিন। এতোটা মূল্যায়ন সে স্বপ্নেও আশা করেনি। সেই প্রথম চিঠিপ্রাপ্তির দিন থেকে আজ অবধি সে যেন এক নিঃসীম স্বপ্নলোকের যাত্রী হয়ে চলেছে।

কফি চলে এলে আদি সাহেব হোসেনকে কফি নেওয়ার অনুরোধ করেন। কফিতে চুমুক দিতে দিতে তিনি বললেন, 'আমার দুর্ভাগ্য যে আপনাকে আমি এতো দেরিতে আবিষ্কার করলাম। আগে কোন কোন পত্রিকায় লিখেছেন আপনি?'

হোসেন সলজ্জ চেহারায় বললো, 'আসলে, আমি এর আগে অন্য কোথাও লিখিনি কখনো।'

চোখজোড়া কপালে উঠে গেলো নয়াদিন সম্পাদকের। দৃষ্টি যে তার কোন দিগন্তে গিয়ে স্থির হয়ে গেলো তা বোঝা গেলো না। তার বিশ্বাস হচ্ছে না যে, হোসেন এর আগে অন্য কোথাও লেখালেখি করেনি। তিনি বিস্ময় জড়ানো কণ্ঠে বললেন, 'মাই গুডনেস! আপনি এর আগে কোথাও লেখেননি?'

'জি না।'

'আই সি! আপনি তো আস্ত একটা আশ্চর্য মানুষ ভাই! মানে সত্যি বলছি, আমার এখন মনে হচ্ছে, আপনার ভিনগ্রহী আগন্তুক গল্পটার চরিত্রের মতো আপনিও অন্যকোনো গ্রহ থেকে টুস করে এখানে এসে পড়েছেন! আই অ্যাম টোটালি এস্টোনিশড!'

হোসেন নির্বাক, মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে শুনে যায় নয়াদিন সম্পাদকের কথা।

'তার মানে, নয়াদিনেই আপনার প্রথম লেখা ছাপা হয়েছে?'

'জি।'

'অ্যামেইজিং!' সম্মুখে উপবিষ্ট নয়াদিন সম্পাদকের চোখেমুখে গভীর উত্তেজনার ছাপ। 'হাজারো মানুষের কাছে যা স্বপ্নেরও অতীত, আপনার জীবনে তা সহজ

বাস্তবতা! You are so lucky Mr. Hossen, and we are lucky as well to have the chance to discover a merit like you'.

কথা-আড্ডায় বিস্ময়-পর্ব পার হয়ে যায়, বেলা গড়িয়ে তখন সন্ধ্যা হয় হয় অবস্থা। হোসেন বললো, 'নয়াদিন পত্রিকা এবং তাদের বদান্যতার কথা অনেকদিন মনে থাকবে আমার। স্মৃতিটুকু জীবনের আনন্দ হিশেবে জমা রেখে দেবো।'

হোসেনের কথার সুরে বিদায়ের আভাস পেয়ে আদি সাহেব বললেন, 'কিন্তু মিস্টার হোসেন, নয়াদিন তো আপনার সাথে সেই আনন্দ-স্মৃতিকে অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করতে চায়।'

ধড়ফড় করে ওঠে হোসেনের বুক। মনে হলো সেই আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তের একেবারে সন্নিকটে দাঁড়িয়ে হোসেন। হাত বাড়ালেই ছুঁতে পাবে স্বপ্ন, যে স্বপ্ন আকাশের নীলের মতোই অসীম, ঝরনার জলের মতোই নির্ঝর। কিন্তু হোসেন হাত বাড়ায় না, নয়াদিনের বাড়ানো হাতকে স্পর্শ করে স্বপ্নের দুনিয়ায় পদার্পণ করাই তার ইচ্ছে।

'আপনি সম্ভবত বুঝতে পারেননি। যাহোক, খোলাসা করেই বলা যাক। আপনার ভিনগ্রহী আগন্তুক গল্পটা পড়ে আমরা, মানে নয়াদিন পরিবার সত্যিকার অর্থেই বিমোহিত হয়েছি। এমন চমৎকার বর্ণনাশৈলীতে ভরপুর এতো দুর্দান্ত গল্পের দেখা হররোজ মেলে না। আমরা বেশ অনেকদিন থেকে একজন সম্পাদকের খোঁজে আছি, যিনি নয়াদিনের একটা বিরাট অংশের দায়িত্ব নিতে সক্ষম। দায়িত্বটা পুরোপুরি লেখালেখি-নির্ভর। যোগ্যতা হিশেবে তাকে অবশ্যই সৃজনশীল চিন্তার অধিকারী এবং ভালো লিখিয়ে হতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেক খুঁজেটুঁজেও আমরা এমন কাউকে পাইনি, যার ওপর নয়াদিন নির্ভয়ে নির্ভর করতে পারে। গড়পড়তা ভালো লেখা তো অনেকেই লেখে মিস্টার হোসেন, কিন্তু সম্পাদকের টেবিলে থাকা আমাদের মতো মানুষগুলোই জানে ওসব লেখার কতোখানি সত্যিকার লেখা হয়ে ওঠে। কিন্তু আপনার গল্পটা পড়বার পর থেকেই আমার মনে হয়েছে, ইউ আর দ্য পারসন উই আর লুকিং ফর। আপনাকে নিয়ে আমাদের এখানে দু-দফা বৈঠক হয়েছে। আপনার গল্পটার শক্তির জায়গা, কাহিনি-বিন্যাসে আপনার মুনশিয়ানা এবং গল্পের ভাষা নির্মাণে আপনার যে শিল্প-মন, তার সবিস্তার ব্যাখ্যা আমি সকলের কাছে পরিষ্কার করেছি। আপনার লেখাটাকে আতশ কাচের নিচে অনেক যাচাই-বাছাই করার পরেই কিন্তু আপনাকে চায়ের নিমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র লেখা হয়েছে।'

'কিন্তু...'

হোসেনকে থামিয়ে দেন নয়াদিন সম্পাদক। স্মিত হেসে তিনি বলেন, 'আমি জানি আপনি এখন কী বলবেন। আপনার একটামাত্র গল্প পড়ে নয়াদিনের মতো এমন তুখোড় জনপ্রিয় একটা পত্রিকা এই উপসংহারে কীভাবে আসতে পারে যে, আপনি এই কাজের উপযুক্ত, তাই তো?'

চুপ করে থাকে হোসেন। নীরবতাকেই সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে তিনি পুনরায় বলেন, 'না, নয়াদিন এমন কাঁচা কাজ কখনোই করবে না মিস্টার হোসেন। নয়াদিন বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ কয়েকটা সাহিত্য-পত্রিকার মধ্যে অন্যতম। এমন একটা পত্রিকা কারও একটা লেখা পড়ে তাকে এতোবড়ো পদে এনে বসিয়ে দেবে, এমন দুর্মতি নয়াদিন কর্তৃপক্ষের হয়নি।'

আলোচনাটা এবার জটিল থেকে জটিলতর হতে শুরু করেছে। আদি সাহেব কেবল দেখতেই সুদর্শন নন, গুছিয়ে কথা বলাতেও তিনি বেশ সিদ্ধহস্ত। শ্রোতাকে মুগ্ধ করে রাখবার একটা সম্মোহনী শক্তি আছে তার গলায়। নয়াদিন বেশ যোগ্য লোককেই বসিয়েছে তাদের সর্বোচ্চ পদে—হোসেন ভাবে।

'মিস্টার হোসেন', হোসেনের ভাবনায় ছেদ পড়লো আদি সাহেবের কথায়। 'আপনি সম্ভবত বুঝতে পারছেন যে, নয়াদিন পত্রিকা আপনাকে একটা দুর্দান্ত কাজের সুযোগ দিতে চায়, যা আপনার প্রতিভাকে বিকশিত করার কাজে সহায়ক হবে। তবে এর জন্যে আপনাকে আরও একটু পরিশ্রম করতে হবে।'

'যেমন?', জানতে চাইলো হোসেন।

খানিকটা নড়েচড়ে বসলেন আদি সাহেব। পাশে থাকা পানির বোতল থেকে ঢকঢক করে পানি গিলে নিয়ে বললেন, 'সামনের নারী দিবসকে কেন্দ্র করে আমাদের একটা বড়ো প্রজেক্ট আছে। প্রজেক্টটির নাম মহীয়সী। আমাদের দেশে যারা নারীমুক্তির আন্দোলনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের জীবনকে তুলে ধরাই ওই প্রজেক্টটির মূল লক্ষ্য।'

'কিন্তু আমার কাজ কী হবে এখানে?'

'আপনার কাজ খুব সহজ, মিস্টার হোসেন। আপনার সত্তার সাথেও তা ভীষণভাবে যায়।'

'দুঃখিত, আমি বুঝতে পারলাম না ঠিক।'

হো হো করে হেসে উঠলেন আদি সাহেব। হাসতে হাসতেই বললেন, 'না বুঝতে পারাটাই স্বাভাবিক। আপনার জায়গায় আমি হলেও হয়তো বুঝতাম না। যাহোক, আর কোনো ভূমিকা নয়, আমরা সরাসরি কাজের কথায় ঢুকে পড়ি। আপনি যে ভালো গল্প লেখেন তা আপনার গল্পটা পড়েই আমরা নিশ্চিত হয়েছি। তবে, নয়াদিনে কাজ করতে হলে আমাদের জন্য আপনাকে আরও একটা গল্প লিখতে হবে। এবারের গল্পের প্লট আমরাই আপনাকে দিয়ে দেবো। এটাকে ঠিক প্লট বলা যায় না যদিও, বলতে পারেন কাহিনি-বিন্যাসের একটা প্রাথমিক সূত্র। আপনাকে সেই সূত্র ধরে আগাতে হবে এবং লিখতে হবে একটা পূর্ণাঙ্গ গল্প। ধরে নিতে পারেন, ওটাই আপনার কাজের ফাইনাল ইন্টারভিউ। ওটাতেও যদি আপনি নয়াদিনকে সন্তুষ্ট করতে পারেন, উই আর রেডি টু কনগ্র্যাচুলেট ইউ হিয়ার।'

স্বপ্নটাকে যতোটা সহজলভ্য মনে হয়েছিলো প্রথমে, সেটা আসলে ততোটা সহজ নয়। কিন্তু হোসেন দমে যাওয়ার পাত্র না। এতোদূর এসেও ব্যর্থ-মনোরথে ফিরে যাবে, তা হতে দেওয়া যায় না। আর, একটা গল্পই তো তারা চাইলো কেবল! গল্প লিখতে হোসেনের ভালোই লাগে। ডায়েরিতে কতো কতো গল্প লিখে ড্রয়ারবন্দী করেছে সে! জোছনার গল্প, জোনাকি আর ঝিঁঝিপোকার গল্প, তারাদের গল্প, নীল আকাশের গল্প। কী নিয়ে গল্প লেখেনি সে?

'ঠিক আছে। নয়াদিনের এই প্রস্তাবে আমি রাজি আছি', মুহূর্ত বাদে আদি সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বললো হোসেন।

'ধন্যবাদ। আমি জানতাম আপনি দ্বিমত করবেন না। একজন জাত গল্পকার মানুষ গল্প লিখবার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে পারেই না।'

আরও অনেক গল্প হয় দু'জনের মাঝে। হোসেনকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় গল্প লিখবার প্রাথমিক সূত্রও। সুলেখা সাথী নামের একজন পরিচিত নিবেদিতপ্রাণ নারী আন্দোলন কর্মীকে ঘিরেই রচিত হবে 'মহীয়সী' নামের গল্পটি। কিন্তু যাকে ঘিরে রচিত হবে গল্প, তার সম্পর্কে তো হোসেনের জানা থাকা চাই। সে বন্দোবস্ত নয়াদিন পত্রিকা

করে দেবে। মিস সুলেখা সাথীর বাসায় আগামীকাল এবং তার পরের দিন হোসেন যাবে এবং গল্পের জন্য যতোখানি তথ্যের রসদ দরকার, সবটা সুলেখা সাথীর মুখ থেকেই শুনে নেবে সে।

[চার]

বড়ো একটা অ্যাপার্টমেন্টের কাছে এসে দাঁড়ালো হোসেনের রিকশা। রিকশাওয়ালা তার গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললো, 'নামেন মামা। এই বাসাডাই।'

হোসেন তার নোটবুকে টুকে আনা ঠিকানার সাথে মিলিয়ে নেয় একবার। হ্যাঁ, চলে এসেছে সে সঠিক জায়গায়। রিকশাভাড়া চুকিয়ে দিয়ে গেইটের কাছে আসতেই বুড়োমতো একজন লোক দৌড়ে এলো হোসেনের দিকে।

'কী চাই?'

'এটা তো মিস সুলেখা সাথীর বাসা, তাই না?'

'জি।'

'আমি সাপ্তাহিক নয়াদিন পত্রিকা থেকে এসেছি মিস সুলেখা সাথীর সাথে দেখা করতে।'

'আপনার নাম?'

'হোসেন।'

বয়স্ক ভদ্রলোক গেইট খুলে দিয়ে বললেন, 'আসুন।'

হোসেন ভেতরে ঢুকতেই তিনি পুনরায় বললেন, 'সোজা গিয়ে হাতের বামে লিফট। তিন নম্বর ফ্লোরে থাকেন সুলেখা ম্যাডাম।'

লোকটাকে হয়তো আগ থেকেই সব বলে দেওয়া ছিলো, তাই প্রবেশ-পথে কোনো বিড়ম্বনার শিকার হতে হলো না হোসেনকে। লিফটের কাছাকাছি যেতেই আরও একজন বয়স্ক মানুষের দেখা মিললো। তিনি নিজ থেকেই বললেন, 'আপনার নাম কি হোসেন?'

'জি।'

'আমার সাথে আসুন, ম্যাডাম আপনাকে সাথে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

এখানে সবকিছু এতো গোছালো দেখে নয়াদিন সম্পাদককে মনে মনে একটা ধন্যবাদ দিলো হোসেন। লোকটা সত্যিই কাজের মানুষ!

হোসেন কোনোদিন রাজপ্রাসাদ দেখেনি, কিন্তু মিস সুলেখা বেগমের বাসায় প্রবেশ করে হোসেনের মনে হলো, সে সত্যি সত্যি একটা অনিন্দ্য সুন্দর রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়েছে। কী অপূর্ব সুন্দর করে সাজানো চারদিক! দেয়ালে দেয়ালে শ্বেত পাথরের কারুকাজ। দেখলে মনে হয় যেন গভীর সমুদ্রতলের অপার সৌন্দর্য এখানে লেপ্টে দেওয়া হয়েছে। সেগুলোর আশেপাশে কতো বিচিত্র রঙের আল্পনা আঁকা! দামি পেইন্টিংয়ে ফুটে উঠেছে শহুরে আভিজাত্য! বহুমূল্য আসবাবের দিকে তাকালে ঘরটাকে পাঁচতারা হোটেল, আর দুর্লভ সংগ্রহে চোখ পড়লে রীতিমতো জাদুঘর না ভেবে উপায় থাকে না।

হোসেন একটা নরম, শাদা সোফায় গিয়ে বসে। চারদিকের এতো এতো দামি জিনিসপত্রের মাঝখানে নিজেকে খুবই বেমানান আর অসহায় লাগে তার। ঘরটার যেখানেই চোখ পড়ছে, সেখানেই দৃষ্টি থতমত খেয়ে থমকে যেতে চাইছে।

'সুপ্রভাত মিস্টার হোসেন', একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো হোসেনের কানে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে সে দেখে, জলপাই রঙের শাড়ি পরা এক মহিলা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে হোসেনের মনোযোগ নিবিষ্ট ছিলো বলে মহিলার আগমন-বার্তা টের পায়নি সে।

বসা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হোসেন বলে, 'সুপ্রভাত।'

'আপনিই তাহলে ভিনগ্রহী আগন্তুক গল্পটার লেখক! আমি তো ভেবেছিলাম বেশ বয়সটয়স হবে আপনার, কিন্তু আদিত্য সাহেবের কাছে আপনার ব্যাপারে শুনে অনেকটাই তাজ্জব হয়েছি বৈ কি! তা যা-ই হোক মিস্টার হোসেন, গল্পটা কিন্তু সুপার-ডুপার লেভেলের! কনগ্র্যাটস!'

'ধন্যবাদ।'

'কী খাবেন? চা না কফি?'

'চা।'

মিস সুলেখা গলা ছেড়ে বললেন, 'রাজিয়া, অ্যাই রাজিয়া...।'

রাজিয়ার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে তিনি হনহন করে হেঁটে চলে গেলেন ভেতরে। একটু পরে এসে বললেন, 'দুঃখিত মিস্টার হোসেন, আপনাকে একা বসিয়ে রেখে গিয়েছিলাম।'

'না না, কোনো সমস্যা নেই।'

'আপনি সম্ভবত আমার একটা ইন্টারভিউ নিতে এসেছেন, তাই না?'

'ঠিক ইন্টারভিউ নয় আসলে। নয়াদিন পত্রিকা আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছে। মহীয়সী শিরোনামে আমাকে একটা গল্প লিখতে হবে। ওই গল্পটার পটভূমিকায় থাকবেন মূলত আপনি। ধরে নিতে পারেন, আপনার জীবন এবং কাজকে ঘিরে আমাকে গল্পটা লিখতে হবে।'

'ফাইন। আপনার মতো দুর্দান্ত গল্পকারের হাতে আমার বিনির্মাণ হবে জেনে পুলক অনুভব করছি।'

'আমি কিন্তু বিখ্যাত কেউ নই।'

'তবে বিখ্যাত হতে যাচ্ছেন। হা হা হা।'

'মহীয়সী' গল্পটা লিখবার রসদ সংগ্রহের নিমিত্তে মিস সুলেখা সাথীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যায় হোসেন। রাজিয়া নামের সাত বা আট বছরের একটা মেয়ে চা নিয়ে এলে মিস সুলেখা তাকে বললেন, 'উনাকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দে।'

হোসেনের জন্য ট্রে থেকে চায়ের কাপ তুলতে গেলে চা সমেত কাপটা রাজিয়ার হাত থেকে উল্টে পড়ে যায়। টেবিলে থাকা একটা নোটপ্যাড চা লেগে ভিজে নাস্তানাবুদ হয় সাথে সাথে। এতোক্ষণ ধরে মিস সুলেখার সাথে আলাপের চুম্বকাংশ এই প্যাডে টুকে নিচ্ছিলো হোসেন। ঘটনাটায় রেগেমেগে আগুন হয়ে যান মিস সুলেখা। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনি বেসামাল হয়ে ওঠেন। রাজিয়ার গালে কষে একটা চড় লাগিয়ে দিয়ে বেশ তিরিক্ষি গলায় চেঁচিয়ে উঠে বলেন, 'দূর হ আমার চোখের সামনে থেকে। আপদ কোথাকার! একটা কাজ ঠিকমতো করতে পারিস না!'

শান্ত পরিবেশে হঠাৎ কেমন যেন স্পষ্ট হতে লাগলো একটা অস্থিরতার ছাপ। ধমক খেয়ে রাজিয়া ভয়ে কাঁপতে শুরু করলো। ভয়ার্ত হরিণীর মতো তার চোখ দুটো বিহ্বল হয়ে উঠেছে। সে বুঝতে পারছে না কার কাছে ক্ষমা চাইবে। মিস সুলেখার কাছে, না হোসেনের কাছে।

নোটে টুকে নেওয়া লেখাগুলো ভিজে নষ্ট হওয়াতে হোসেন তেমন কষ্ট না পেলেও, বেচারি রাজিয়াকে এমন বেকায়দায় পড়তে দেখে তার মনটা হুহু করে উঠলো।

মিস সুলেখা অনুনয়ের সুরে হোসেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার নোটপ্যাডটা নষ্টই হয়ে গেলো! কিছু মনে করবেন না মিস্টার হোসেন।'

'না না, এটা মোটেও সিরিয়াস ব্যাপার নয়। এগুলো আমার মনেই থাকবে সব। নোট করার একটা অভ্যাস আছে বলেই আসলে নোট করা।'

সোফায় বসতে বসতে সুলেখা সাথী বললেন, 'আর বলবেন না! বাসায় একদল জন্তু-জানোয়ার পালছি আমি। কারও দ্বারা কোনো কাজ হয় না। একটা কাজ যদি এরা ভালোমতো করতে পারতো! কিন্তু অন্ন-ধ্বংসের বেলাতে সবাই একেবারে সোয়া সের!।'

হোসেন নির্বিকার হয়ে বসে থাকে। এমন কোনো সাংঘাতিক ঘটনা এখানে ঘটেনি, যার জন্যে মিস সুলেখাকে এতোখানি উত্তেজিত হতে হবে। একটা বাচ্চা মেয়ের হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে যাওয়াটা আহামরি কোনো ব্যাপার নয়। আর, দামি দামি জিনিসপত্রে ভরপুর যার ঘর, একটা কাচের কাপ ভাঙাতে তার কী এমন ক্ষতি হয়ে গেলো বোঝা গেলো না। মিস সুলেখার এমন অকারণ রাগ এবং নিরীহ কাজের মেয়ের ওপরে এমন চড়াও মনোভাব হোসেনকে দারুণভাবে হতাশ করলো। এমন একটা চরিত্রকে সে 'মহীয়সী' গল্পের জন্য কোনোভাবেই কল্পনা করতে পারছে না।

'মিস্টার হোসেন', মিস সুলেখার কণ্ঠে আবার স্নিগ্ধতা ফিরে আসে। সংবিৎ ফিরে পায় হোসেন।

'জি।'

'আপনাকে আরেকটু কষ্ট দেবো। একটা জরুরি প্রোগ্রামে আমাকে যেতে হবে এখন। বেশি দূরে নয় যদিও, বেইলী রোডেই। আপনার যদি কোনো অসুবিধে না হয়, আমি না ফেরা পর্যন্ত আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করবেন, প্লিজ।'

'কোনো সমস্যা নেই। আমি অপেক্ষা করবো।'

'থ্যাংকিউ মিস্টার হোসেন।'

[পাঁচ]

হোসেনের চোখ আটকে আছে 'দূরবীন' টিভির পর্দায়। তাতে ঘটা করে বেইলী রোডে অনুষ্ঠিত হওয়া 'নারী অধিকার আন্দোলনের লাইভ প্রোগ্রাম দেখানো হচ্ছে। কোনো এক মহিলা গার্মেন্টস কর্মীর গায়ে হাত তোলায় গার্মেন্টস মালিকের ওপর ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয়েছেন তারা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই প্রতিবাদী জনসভা, এবং তাতে অন্যতম প্রধান অতিথি হিশেবে যোগ দিয়েছেন নারী আন্দোলনের সুপরিচিত মুখ সুলেখা সাথী।

আনুষ্ঠানিকতা পর্ব শেষ হলে মঞ্চে সুলেখা সাথীকে তার বক্তব্য প্রদানের জন্য আহ্বান করা হয়। স্টেজে উঠে সুলেখা সাথী নারীর অধিকার সচেতনতা, নারীর কাজ এবং জীবনের স্বাধীনতা, শৃঙ্খল থেকে নারীর মুক্তির নানান কায়দা-কানুন এবং কর্তব্যের কথা বলার পর বললেন, 'আমি এখানে দাঁড়িয়ে ওই গার্মেন্টস মালিক, যে কিনা তার একজন মহিলা কর্মীর গায়ে হাত তোলার দুঃসাহস দেখিয়েছে, তার যথোপযুক্ত শাস্তির দাবি করছি। নিঃসন্দেহে এটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারীকে শোষণের একটা করুণ দৃশ্যপট! একজন নারীকে অসম্মান করার, তার গায়ে হাত তোলার, তাকে অপমান-অপদস্থ করার অধিকার এই পুরুষ সমাজকে কে দিয়েছে? আমি আমাদের নারী সমাজকে বলতে চাই, আপনারা আপনাদের বেদনার কথা মন খুলে বলুন। আমরা পুরুষতান্ত্রিকতা বিবর্জিত, নারীর জন্য মুক্ত-স্বাধীন একটা দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখি, যেখানে নারী তার অধিকার বুঝে নেবে কড়ায়-গন্ডায়। নারী সমাজকে যে বা যারাই অপমান করতে চাইবে, শোষণ করতে চাইবে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা গড়ে তুলব দুর্বার আন্দোলন। আগামীর বাংলাদেশ পুরুষের শোষণমুক্ত, নারী অধিকারের বাংলাদেশ।'

মিস সুলেখা সাথীর কথাগুলো এরচে বেশি আর শুনতে পারল না হোসেন। রিমোট কন্ট্রোলে জোরে কষাঘাত করে টিভির সুইচ অফ করে দিলো সে। ভিজে যাওয়া নোটপ্যাডটার দিকে বারংবার তাকাচ্ছে হোসেন। কুঁচকে যাওয়া সেই কাগজগুলোর ভেতর থেকে যেন একটা প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে—'দূর হ এখান থেকে। আপদ কোথাকার! একটা কাজ ঠিকমতো করতে পারিস না!'

[ছয়]

'কিন্তু মিস্টার হোসেন', বললেন নয়াদিন সম্পাদক আদিত্য আদি, 'আমরা আপনার ওপরে ভরসা করে অন্য কোনো অপশন চিন্তাও করিনি। এই মুহূর্তে এসে আপনি কিনা বলছেন যে, মহীয়সী গল্পটা আপনি লিখতে পারবেন না!'

হোসেন বেশ গম্ভীর গলায় বললো, 'জি, আমি ঠিক করেছি ওই গল্পটা আমি লিখবো না।'

'আমি পত্রিকার একজন সম্পাদক মাত্র, মিস্টার হোসেন। পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে আমি কী জবাব দেবো আপনি বলতে পারেন?'

'তাদের বলবেন, আমি গল্পটা লিখতে অপারগ। আমার অপারগতাকে তারা যেন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।'

'কিন্তু সমস্যাটা ঠিক কোথায় তা তো জানতে হবে, তাই না?'

'সমস্যাটা পুরোটাই আমার। আমি আসলে এমন কাউকে নিয়ে গল্প লিখতে পারি না, যিনি তার কাজে, তার কথায় সৎ নন। যিনি নিজের ঘরে একজন অত্যাচারী, কিন্তু বহিরাবরণে বেশ ধরেন ত্রাণকর্তার।'

'মিস্টার হোসেন, আমি বুঝতে পারছি না আপনার কথা।'

'আপনাকে বুঝাতে পারছি না বলে ক্ষমাপ্রার্থী। এখানে স্বপ্নের মতো কিছু সময় কেটেছে আমার। এমন দুর্দান্ত মুহূর্তগুলো আমাকে উপহার দেওয়ার জন্যে কৃতজ্ঞতা। ভালো থাকবেন।'

আজীবনের লালিত একটা স্বপ্নকে পায়ে ঠেলে চলে যাচ্ছে হোসেন। একটা ভালো ক্যারিয়ার, একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, একটা নির্মল, নিষ্কণ্টক জীবনের হাতছানিকে। কিন্তু হোসেন একটুও বেদনাহত নয়। স্বপ্নভঙ্গের যাতনা তাকে কাবু করেনি মোটেও। যে সত্যের মুখোমুখি হোসেন হয়েছে, সেই সত্যকে ধারণ করতে পারাটাও তার জীবনের সেরা একটা প্রাপ্তি।

মিস সুলেখা সাথীর জীবন নিয়ে মহীয়সী শিরোনামে একটা গল্প হোসেন যখন-তখন লিখে দিতে পারে। গল্পে মিস সুলেখা সাথীকে মহীয়সী, আলো হাতে চলা এক

নির্ভীক নারীমূর্তি আর সমাজের এক অনন্য দর্পণ হিশেবে তুলে ধরতে হোসেনকে একদমই বেগ পেতে হবে না। কিন্তু মিস সুলেখা সাথীর সাথে এই বিশেষণগুলো কতোখানি খাপ খায়? যে মহিলা নিজের ঘরের কাজের মেয়ের সাথেই সামান্য ব্যাপারে এমন অমানবিক আচরণ করতে পারে, তার গায়ে হাত তুলতে পারে, সে যখন অন্য এক নির্যাতিত মহিলার জন্যে কাঁদে, জনসভা করে, রক্ত-গরম করা বক্তৃতা দেয়, তখন তা মাছের মায়ের পুত্রশোকের মতোই শোনায় বৈ কি! সেই কান্নায় সত্যিকার আবেগ নেই, রক্তে আগুন ধরানো সেই কথাগুলোতে নেই সত্যিকার প্রতিবাদের সুর। দিনশেষে তা কেবল জনপ্রিয়তা আর আখের গোছানোর মাধ্যম ছাড়া আর কী হবে? এমন এক নারী-চরিত্রকে মহান, মহীয়ান, মহানুভবতার রূপ দিতে হোসেন তাই ভীষণ অনীহ। হোসেন আর যা-ই হোক, নিজের সাথে অসৎ হতে পারবে না।

[সাত]

হেমন্তের দুপুর। দিনগুলো বড্ড ছোটো এ সময়। সকাল হওয়ার আগে যেন দুপুর হয়ে যায়, বিকেলের আগে নেমে যায় সন্ধ্যা। কিন্তু দুপুরবেলার রোদটা বেশ ঝাঁঝালো। সেই ঝাঁঝালো রোদে চামড়ায় আগুন ধরে যাওয়ার অবস্থা দাঁড়ায় কখনোসখনো।

এমন এক তীব্র দাবদাহের দুপুরে, পাট-পাতার বেড়া দিয়ে তৈরি রান্নাঘরে চুলোয় ভাত বসিয়েছেন জাহানারা বেগম। ভাতের মধ্যে একটা আলু আর কয়েকটা কাঁচামরিচ দেওয়া। ধোঁয়ায় চারদিক যেন অন্ধকার হয়ে উঠেছে।

নিঃশব্দে রান্নাঘরের কাছে এসে দাঁড়ালো হোসেন। সে দেখতে পেলো, ভীষণ মনোযোগের সাথে তার মা চুলোয় আগুন ধরাবার চেষ্টা করছেন। কেন জানি, আগুন জ্বলে উঠেও পরমুহূর্তে নিভে যাচ্ছে আবার। জাহানারা বেগমও দমে যান না, যতোবার নিভে যায় আগুন, ততোবার তিনি দ্বিগুণ প্রচেষ্টায় মুখর হয়ে ওঠেন।

যেভাবে নিঃশব্দে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলো হোসেন, সেভাবেই সরে গেলো সে। তার হাতে সময় খুব কম। মহীয়সী গল্পটা তাকে লিখতেই হবে, যেভাবেই হোক।

[আট]

সাপ্তাহিক নয়াদিন পত্রিকার ঠিকানায় একটা চিঠি পাঠাচ্ছে হোসেন। সাথে খামে মোড়ানো তার লেখা মহীয়সী গল্পটাও।

বরাবর,
সম্পাদক
সাপ্তাহিক নয়াদিন

জনাব, আমার প্রীতি জানবেন। আপনার সাথে কাটানো মধুময় সময়গুলো উপভোগ করেছি বেশ। পাড়া-গাঁ থেকে যাওয়া একজন নিতান্ত সাধারণ যুবকের লেখার যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আপনি করেছেন, তাতে আমি রীতিমতো মুগ্ধ হয়েছি। আপনার অকৃপণ আন্তরিকতা এবং হৃদ্যতা অনেকদিন মনে রাখবো।

আপনার সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎটা যথেষ্ট আন্তরিকতার ছিলো না বলে আমি ভীষণ দুঃখিত। আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে—মহীয়সী শিরোনামের গল্পটা আমি শেষ পর্যন্ত লিখতে পেরেছি। তবে, এই গল্প সুলেখা সাথীর নয়, আমার মা জাহানারা বেগমের।

মহীয়সী বলে যদি কাউকে কল্পনা করতে হয়, মা তখন আমার কাছে সবথেকে সেরা উদাহরণ। সেই ছোটোবেলায় বাবাকে হারানোর পর থেকে মায়ের সংগ্রাম দেখতে দেখতে বেড়ে উঠেছি আমি। স্বামী হারানো একজন সরলা নারীর জীবনে যতোখানি সংগ্রামের গদ্য আর পদ্য থাকতে হয়, আমি দেখেছি, আমার মায়ের জীবনে তার সবটাই ভীষণ-রকম উপস্থিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো, এই মহীয়সী নারী-চরিত্রকে এতো কাছে থেকেও আমি এতোদিন চিনতে পারিনি। বুঝতেও পারিনি তার ত্যাগের মাহাত্ম্য, আবিষ্কার করতে পারিনি তার সংগ্রামের সাহসী গল্পটাকে। নয়াদিন পত্রিকাকে আরও একটা ধন্যবাদ এই কারণে যে, সুলেখা সাথী নামের একজনের মুখোমুখি তারা আমাকে না করলে হয়তো আমার মায়ের গল্পটা আমার সামনে কখনোই ভাস্বর হয়ে উঠতো না। আমি হয়তো কখনোই অনুধাবন করতে পারতাম না একজন সত্যিকারের মহীয়সী কাকে বলে।

আপনাদের পছন্দের চরিত্রকে মহীয়সীরূপে চিত্রায়িত করতে না পারার জন্যেও দুঃখিত। আমি জানি না তিনি সত্যিকারের মহীয়সী চরিত্র কি না, তবে গল্পের মহীয়সীকে নিয়ে একবিন্দুও সংকোচ নেই আমার। আমার কাছে তিনিই অনন্যা, তিনিই মহীয়সী। তাই তার গল্পটাই লিখে পাঠালাম।

ইতি

হোসেন

হোসেন জানে তার এই গল্প নয়াদিন পত্রিকা কোনোদিন ছাপাবে না। এই গল্পে শহুরে আভিজাত্য নেই, নেই চোখধাঁধানো প্রাসাদ কিংবা হুংকার আর তর্জন-গর্জনের উপাদান। এই গল্প এক গ্রামীণ সাধারণ নারীর গল্প। এই গল্প নিয়ে অন্তত আর যা-ই হোক—বাণিজ্য হবে না। কিন্তু গল্পটা লিখতে পেরে হোসেন পুলক অনুভব করছে। সত্যকে আলিঙ্গান আর মুখোশের আড়ালে থাকা মিথ্যাকে পায়ে ঠেলতে পারার আনন্দে আনন্দিত সে।

সফলতা সমাচার

[এক]

আমি তখন হাইস্কুলে পড়ি। বিদ্যের জাহাজ হবার স্বপ্নে বিভোর। জগতের সবকিছু নিয়েই যেন আমার নিরন্তর কৌতূহল। এটা-ওটা নিয়ে সারাক্ষণ ক্লাসে স্যারদের প্রশ্ন করতাম। আমার জিজ্ঞাসা-যন্ত্রণায় স্যারেরা তো অতিষ্ঠই, এমনকি আমার সহপাঠী, যারাও আমার মতো দুরন্ত আর দস্যিপনায় দুর্বিনীত, তারা পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে যেতো।

একদিন একেবারে হঠাৎ করে আমাদের ক্লাসে আগমন ঘটলো নতুন এক মুখের। ছোকরা যে আস্ত একটা হাবাগোবা সেটা তার চেহারা দেখলেই বিলক্ষণ বুঝে ফেলা যায়। ফ্যালফ্যাল তার চাহনি। শরীরের তুলনায় মাথাটা প্রকাণ্ড। ব্যাটা যে কেবল হাবাগোবা নয়; ভীষণরকম ভীতুও—সেটা বোঝা গেলো একটু পরেই। ইংরেজি ক্লাসের নাঈম স্যার এসে যখন তাকে কমন নাউনের দুটো উদাহরণ দিতে বললেন, ভয়ে তখন তার হাঁটু কাঁপাকাঁপি অবস্থা। একেবারে নতুন মুখ দেখেই স্যার জিগ্যেশ করলেন, 'নাম কী?'

ছেলেটা মিনমিন করে বললো, 'আলাদিন।'

আমাদের ক্লাসের সবচাইতে ফাজিলটার নাম ছিলো শফিক। যেকোনো কিছু নিয়ে মুহূর্তে কৌতুক বানাতে সে ছিলো সিদ্ধহস্ত। হাবাগোবাটার নাম 'আলাদিন' শুনে সে ঘাড় ফিরিয়ে বললো, 'বাবা আলাদিন, চেরাগটা কি পকেটে পুরেছ না ব্যাগে?'

শফিকের এ ধরনের কৌতুক আমাদের সব সময় আলাদা মজা দেয়। তার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলাম আমরা সবাই। হাসলো না কেবল ছেলেটা। তার সেই আদি এবং অকৃত্রিম ফ্যালফ্যাল চেহারা নিয়ে সে স্যারের দিকে তাকিয়ে রইলো। একবার মনে হলো, এই ছেলেটার জন্ম না হলে 'হাবাগোবা' শব্দটা বুঝি অপূর্ণই রয়ে যেতো।

এরপর ছিলো বাংলা ক্লাস। দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে মজার ক্লাস এইটাই। এক অসম্ভব রূপবতী ম্যাডাম আমাদের বাংলা পড়াতেন। রূপের কারণেই হোক কিংবা শখের কারণে—বাংলা ক্লাসে বাংলা পড়ানোর চেয়ে তিনি গল্পই করতেন বেশি। সেই গল্পগুলোর সবটা জুড়ে কেবল নিজের বন্দনা। সেদিনও তার ব্যক্তিক্রম হয়নি। বাংলা বইটায় একটুখানি চোখ বুলিয়ে পেছনের বেঞ্চের একটা মেয়েকে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'এই সানজিদা, ওমন ঝিমুচ্ছিস কেন? রাতে ঘুমোসনি? তোর মতন বয়েসে আমরা কতো সিনসিয়ার ছিলাম পড়াশোনা নিয়ে জানিস?'

ম্যাডামের আত্ম-বন্দনার গল্পগুলো সব সময় এভাবেই শুরু হয়। প্রথমে কারও কোনো খুঁত বের করবেন, এরপর ওই বিষয়ে ম্যাডাম কেন অনন্যা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অপরাজিতা ছিলেন তা বর্ণনার মাধ্যমে মেলতে শুরু করে গল্পের ডালপালা। সানজিদাকে ধমকানির নেপথ্য-কারণও যে তা-ই, তা আমরা বিলকুল জানি। হলো ঠিক তা-ই। স্কুলজীবনে তিনি কেমন দুরন্ত ছিলেন, কেমন করে ক্লাসের ছেলেমেয়েদের ওপরে খবরদারি করতেন, ক্লাসে তার ভয়ে সবাই কীরকম তটস্থ থাকত, উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় তার বক্তৃতা শুনে কীভাবে স্কুলশুদ্ধ লোকজন হা হয়ে গিয়েছিল—এসবই ছিলো গল্পের মূল বিষয়বস্তু। ম্যাডামের এমন ধারার গল্প শুনে হাই তুলতে তুলতে শফিক বললো, 'ম্যাডাম, আপনার গল্প শুনে মনে হচ্ছে আপনি আসলে রাজনীতিবিদ হওয়ার জন্যেই জন্মেছিলেন; কিন্তু রাস্তা ভুল করে আপনি হয়ে গেছেন হাইস্কুলের টিচার।'

শফিকের কথা শুনে ক্লাসশুদ্ধ ছেলেমেয়ে হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়লো। এমনকি, একটু আগে টুলে বসে বসে ঝিমুতে থাকা সানজিদাও সেই অট্টহাসিতে লুটোপুটি খাওয়ার মতন অবস্থা। হাসলো না কেবল হাবাগোবা আলাদিন।

হ্যাঁ, সেদিন থেকে আমরা তার নাম রেখেছিলাম হাবাগোবা আলাদিন।

টিফিন পিরিয়ডের পরেই ছিলো বিজ্ঞান ক্লাস। বিজ্ঞান শব্দটা তখন যতোখানি না ভয়ংকর, তার চাইতে বেশি ভয়ংকর ছিলো আমাদের বিজ্ঞান স্যার। হাতির মতন বিশাল দেহ স্যারের। যেদিক দিয়ে হাঁটেন সেদিকটা মনে হয় গমগম করতে থাকে। তার ক্লাস ফাঁকি দেওয়া তো দূর, কেউ হালকা টুঁ শব্দ করবে—এতোবড়ো বুকের পাটা কারও ছিলো না। যে শফিক হাসি-ঠাট্টা করে ক্লাস মাতিয়ে রাখত, সে পর্যন্ত বিজ্ঞান ক্লাসে কাঁকড়ার মতো হাত-পা গুটিয়ে ভালো ছেলের মতো বসে থাকত।

প্রথম দিনেই বিপত্তি বাধালো হাবাগোবা আলাদিন। টিফিন পিরিয়ড থেকেই সে একেবারে লাপাত্তা। আমরা ভাবলাম প্রথম দিনেই এই স্কুলে পড়ার খায়েশ তার মিটে গেছে। তাই হয়তো বা বইটই রেখে একদম বেওয়ারিশের মতো পালিয়েছে। ওকে দিয়ে আর যা-ই হোক, পড়াশোনাটা যে হবে না, সেটা সম্ভবত ও বুঝে গেছে। তাই সুযোগ বুঝে চম্পট!

বিজ্ঞান ক্লাসের তখন মাঝামাঝি সময়। আমাদের সম্মিলিত দৃষ্টি সামনের ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে স্থির হয়ে গেছে। যার দৃষ্টি সেখান থেকে বিচ্যুত হবে, তার ওপর দিয়ে বয়ে যাবে এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়। এই ক্লাসের এটাই চিরাচরিত রীতি। এতোটুকু প্রাণ নিয়ে আমরা প্রতিদিন এই সময়টা পার করি।

কিন্তু সেদিন, সবাইকে অবাক করে দিয়ে কোথা থেকে যেন ঝড়ের মতো ক্লাস-রুমের দরজার কাছে এসে হাজির হলো হাবাগোবা আলাদিন। তাকে দেখে ভূত দেখার মতোই চমকে উঠলাম আমরা সবাই। নিজেদের চোখগুলোকে অবিশ্বাস করতে পারলেই বেশি ভালো লাগত; কিন্তু রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে যে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করি কী করে?

তার পুনরাগমনের ঘটনায় সেদিন আমরা বিস্মিত হইনি। আমরা বিস্মিত হচ্ছিলাম তার ওপর দিয়ে বইতে যাওয়া আসন্ন ঝড়ের তাণ্ডবলীলা কল্পনা করে। আমাদের চোখের সামনে তখন একটাই দৃশ্য। টেবিলের নিচে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে পিঠখানা উপুড় করে রেখেছে হাবাগোবা আলাদিন। ম্যাড়ম্যাড়ে সেই পিঠে বিজ্ঞান স্যারের সাড়ে ছ' কেজি ওজনের কিলগুলো পড়ছে আর তাতে পটাশ পটাশ শব্দ হচ্ছে। এই কিলগুলো হজম করার পর সে যে আর কোনোদিন এ স্কুলমুখী হবে না—সে ব্যাপারে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত।

আমাদের বিজ্ঞান স্যার সরু চোখে ওর দিকে তাকালেন। ভয়ানক ক্ষুধার্ত সিংহ তার আহারের সময় উটকো ঝামেলায় যে ধরনের বিরক্তি প্রকাশ করে, স্যারের চোখেমুখেও সে-রকম তিরিক্ষি ভাব। স্যারের মুখাবয়বের আশু পরিবর্তনে তখন আমাদের হাঁটু পর্যন্ত থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে, বাইরে দণ্ডায়মান হাবাগোবাটার যে কী অবস্থা কে জানে!

সে তখনো বাইরেই দাঁড়ানো। ইশারায় তাকে ভেতরে আসতে বললেন দোর্দণ্ডপ্রতাপের বিজ্ঞান স্যার। ধীরপায়ে ভেতরে ঢুকে স্যারের কাছাকাছি আসতেই তার পেটে চাপ দিয়ে বললেন, 'নাম কী?'

মিনমিন করে সে বললো, 'আলাদিন'।

'আজকেই প্রথম এসেছিস ক্লাসে?'

ভয়ে ভয়ে জবাব এলো, 'জ্বি।'.

'তুই কি জানিস ক্লাস অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে?'

মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো আলাদিন। তাকে নিরুত্তর হতে দেখে এবার তার পেটে আরেকটু জোরে চাপ দিয়ে ধরলেন স্যার। স্যারের অভিজ্ঞ হাতের এমন নাড়ানি খেয়ে একবার কোঁত করে উঠলো সে। স্যার বললেন, 'এতো দেরি হওয়ার কারণ কী? কোথায় গুল মারছিলি?'

তার দৃষ্টি তখনো মাটিতেই নিবদ্ধ। নিচু দৃষ্টি এবং নিচু স্বরে সে বললো, 'স্যার, যুহরের সালাত পড়ার জন্য মসজিদে গিয়েছিলাম। মসজিদ বেশ খানিকটা দূরে। এ জন্যেই দেরি হয়ে গেছে।'

নতুন বলে দয়া করে হোক কিংবা সালাতের কথা শুনে সমীহ করেই হোক, সেদিন হাবাগোবা আলাদিনের পিঠের ওপর দিয়ে যে টর্নেডো বয়ে যাওয়ার দৃশ্য আমরা কল্পনা করেছিলাম, সেটা আর বাস্তব রূপ পেলো না। স্যার তাকে বললেন, 'ঠিক আছে। যা, নিজের জায়গায় গিয়ে বোস।'

আমাদের অঙ্ক স্যার তাকে ডাকত 'আদু ভাই' বলে। স্যারের ধারণা ছিলো সে কোনোদিনও পরের ক্লাস টপকাতে পারবে না। একদিন স্যার তার কাছে জিগ্যেশ করলেন, 'তুই বড় হয়ে কী হবি রে আদু ভাই?'

সে কিছু না বলে মাথা নিচু করে থাকলো। স্যার বললেন, 'আমি বলি তুই কী হবি? তুই হবি মুদি দোকানদার! হা হা হা! বসে বসে মুড়ি বেচবি।'

স্যার এভাবেই তাকে অপমান করতেন আর হাসতেন। স্যারের সাথে হাসতাম আমরাও। ও-ই কেবল মাথা নিচু করে থাকত। লজ্জা আর অপমানে।

চুপচাপ স্বভাবের সেই হাবাগোবা আলাদিন টিফিন পিরিয়ডের পর নিয়ম করেই দেরি করে আসতো এবং অদ্ভুত হলেও সত্য, বিজ্ঞান স্যার কেবল তার জন্য নিজের চিরাচরিত নিয়ম থেকে সরে আসতেন। হাবাগোবাটার জন্যে যেন সাতখুন মাপ!

অন্য আরেকদিনের ঘটনা। বন্ধুদের নিয়ে আয়েশ করে টিফিন খাচ্ছিলাম। আমাদের পাশ দিয়ে হাবাগোবা আলাদিন হেঁটে যাওয়ার সময় মুনতাসির চেঁচিয়ে বললো, 'কীরে মুদি দোকানদার! খাচ্ছিস না যে?'

মুনতাসিরের এহেন পচানি গায়ে মাখলো না সে। মাথা তুলে একবার শুধু আমাদের দিকে তাকালো; এরপর সুড়সুড় করে হেঁটে চলে গেলো নিজের কাজে। ব্যাপারটা বেশ গায়ে লাগলো মুনতাসিরের। বলাই বাহুল্য, শক্তি, তেজ আর শরীরের সাইজে মুনতাসির ছিলো আস্ত একটা পালোয়ানের সমান। আমরা তো বটেই, আমাদের উঁচু ক্লাসের ছাত্ররাও তার সাথে উল্টাপাল্টা করার সাহস পায় না। যাকে-তাকে ধরে ঠেঙিয়ে দেয়ার ব্যাপারে মুনতাসিরের স্কুলজোড়া খ্যাতি। সেই মুনতাসিরের কথাকে অগ্রাহ্য করে চলে যায় কিনা আলাদিনের মতন এক তালপাতার সেপাই!

স্কুল ছুটির পর গেটের বাইরে তার বিশালাকার শরীর নিয়ে পায়চারি করছিল মুনতাসির। বুঝতেই পারছি আলাদিনের ওপরে সে বেজায় চটেছে। হাতির পাড়া আর মুনতাসিরের থাবা—দুটোই আমাদের কাছে সমান জিনিস। আলাদিনের জন্য যে এক মহাদুর্যোগ বাইরে ঘুরপাক খাচ্ছে—সেই আভাস আলাদিনের কাছে পৌঁছেছে কিনা কী জানি!

নাহ, পৌঁছেনি। হাবাগোবা আলাদিন নরম নরম পা ফেলে স্কুল থেকে বেরিয়ে এলো। যেই না সে গেটের মুখে এলো, ওমনি ছোঁ মেরে তাকে একপাশে নিয়ে গেলো মুনতাসির। যেন বাঘের থাবায় বন্দী হরিণ! শিকারি ঈগল লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে, কিন্তু মুনতাসিরের থাবা কখনোই ব্যর্থ হয় না। বেচারা আলাদিন ঘটনার আকস্মিকতায় পুরোই জব্দ! মুখ দিয়ে কোনো শব্দ ছাড়াই ভ্যাবাচ্যাকা চেহারা নিয়ে

অপলক তাকিয়ে রইলো মুনতাসিরের চেহারার দিকে।

অন্যদিন হলে জবাবদিহির আগেই হয়তো মুনতাসির দু-চারটে লাগিয়ে দিতো। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম হলো। এই হাবাগোবাটার বেলাতেই সবাই কেন নিজেদের সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে দেয় সে এক রহস্য! যাহোক, আলাদিনের শার্টের কলার টেনে ধরে, তার সুপারির সমান ছোটো মুখটাকে নিজের মুখের কাছে এনে মুনতাসির জানতে চাইলো, 'এতো ভাব কীসের তোর? তখন যে জানতে চাইলাম খাচ্ছিস না কেন, ভাব দেখিয়ে চলে গেলি কেন? তুই আমাকে চিনিস?'

মুনতাসিরকে চেনে না এমন পোড়ামুখো আমাদের স্কুলে একটাও নেই। যারা চেনে না তারাও তার গল্প শুনতে শুনতে তাকে চিনে ফেলে। সম্ভবত হাবাগোবা আলাদিনও চেনে। সে মুখ নিচু করে বললো, 'আমি সিয়াম রেখেছি। আমি যে সিয়াম রেখেছি সেটা কাউকে জানাতে চাচ্ছিলাম না। তাই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিইনি।'

এমন দিনে কেউ সিয়াম রাখে বলে জানা নেই আমাদের। সিয়ামের মাস তো কবেই গত হয়েছে। ব্যাটা নিশ্চয় ঢপ দিচ্ছে! পাশ থেকে মুখে আঙুল চুষতে চুষতে আমিনুল বলে উঠলো, 'ব্যাটা তো সাংঘাতিক মিথ্যুক রে! এখন কি সিয়ামের মাস নাকি যে সিয়াম রেখেছিস?'

'সিয়ামের মাস ছাড়াও তো সিয়াম রাখা যায়। এগুলোকে বলে নফল সিয়াম। প্রতি সোম আর বৃহস্পতিবার সিয়াম রাখতেন আমাদের নবি।'

আমিনুল পাল্টা জিগ্যেশ করলো, 'কে শিখিয়েছে তোকে এই নতুন জিনিস?'

আলাদিন বললো, 'আমার বাবা রাখেন। বাবাকে দেখে দেখে আমরাও শিখেছি। সপ্তাহের সোম আর বৃহস্পতিবার আমাদের বাসার সবাই সিয়াম রাখে।'

ধপ করে তার কলার ছেড়ে দিলো মুনতাসির। কিছু না বলেই হনহন করে সে হাঁটা ধরল বাড়ির পথে। আমরা একে-অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। যে দৃশ্য উপভোগ করার জন্যে সবাই এতোক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে, তাতে যে এভাবে জল ঢেলে দেওয়া হবে, তা কে জানতো? সেদিনও আসন্ন ঝড়ের তাণ্ডবলীলা আসি আসি করে আর আসল না। নিত্যকার মতো, সেদিনও বেঁচে গেলো হাবাগোবাটা।

ইতঃপূর্বে যা কোনোদিন ঘটেনি একদিন তা-ই ঘটলো। পাশে বোমা ফাটলেও যে আলাদিনের মুখ দিয়ে একটা শব্দ বের হয় না, যে কোনোদিন নিজ থেকে এসে আমাদের সাথে একটা কথাও বলে না, সে-ই কিনা একদিন আমাদের আড্ডার মাঝে এসে বললো, 'আযান হচ্ছে। তোমরা কেউ কি সালাতে যাবে?'

তাকে নিজ থেকে এসে আমাদের সাথে কথা বলতে দেখে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম! আমাদের দিক থেকে কোনো উত্তর তো পায়ইনি সে, তদুপরি আমাদের বিস্ময়মাখা চেহারাগুলো দেখে সেও সম্ভবত হকচকিয়ে গেছে কিছুটা। আবার কথা বললো আলাদিন। খুবই গোছালো, স্পষ্ট ভাষায়—

'যুহরের আযান হচ্ছে। আমার সাথে মসজিদে যাবে? এই যে দেখো, মুয়াজ্জিন বলছে, ''হাইয়্যা আলাল ফালাহ''। মানে হলো—সফলতার পথে এসো। জীবনে সফল হতে চাইলে চলো আমরা সালাতে যাই।'

এতোদিন শুনেছি জীবনে সফল হতে হলে ভালোমতো পড়াশোনা করতে হয়। আজ এই হাবাগোবাটার কাছে নতুন তত্ত্ব শুনলাম বৈকি! সালাতে গেলে নাকি মানুষ সফল হয়! সফলতা বলতে ও কী কচু বোঝে কে জানে! ওর কথায় আমরা কেউ কর্ণপাত করিনি সেদিন। ওর মতো হাবাগোবা, পড়াশোনায় ঢের পিছিয়ে থাকা এক বালকের কাছ থেকে সফলতার পাঠ নেব আমরা? সম্ভবত দুনিয়ায় সফলতার পাঠ দেওয়ার মতো মানুষের তখনো আকাল পড়ে যায়নি।

এরপর? এরপর বলা নেই কওয়া নেই একদিন হুট করেই বাবার বদলি হয়ে যায়। আমাদের পাড়ি জমাতে হয় অন্য একটা শহরে...

[দুই]

ক্যামব্রিজ থেকে পোস্ট-ডক শেষ করে দেশে ফিরেছি। চারদিকে হইচই ফেলে দেওয়া 'গড পার্টিকেল' থিওরির রিসার্চ টিমের অন্যতম সদস্য হওয়ায় আমার তখন দুনিয়াজোড়া খ্যাতি। চাইলেই বিদেশে ভালো ক্যারিয়ার নিয়ে থিতু হওয়া যেতো অনায়েশেই, কিন্তু মন আমার পড়ে রইলো দেশের জল-হাওয়া-মাটিতে। দেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে বড় হওয়া আমাকে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে হলো শেকড়ের টানে। দেশের নামকরা একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিশেবে যোগদান করে হাঁটতে শুরু করলাম আমার লালিত সেই স্বপ্নের পথে।

সময় বয়ে যাচ্ছিল তার নিজস্ব গতিতে। সেই গতিতে কোথাও কোনো হেরফের নেই। সে না দ্রুত না মন্থর। দিন যায়, মাস পেরোয়, বছর ঘুরে আসে—জীবনের ঝুলিতে জমা হতে থাকে হরেক রকমের অভিজ্ঞতা। তবে, একদিন এমন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হলো, যা আমাকে একেবারে ভেতর থেকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। যে অভিজ্ঞতা ভেঙে চুরমার করে দেয় আমার সকল অহংকার আর অহমিকাবোধ। জীবনের কাছে আমি যেন নিতান্তই শিশু হয়ে পড়ি। আমার ইচ্ছে করে হাউমাউ করে কাঁদতে। কিংবা যদি জীবন থেকেই পালিয়ে যেতে পারতাম! যদি হারিয়ে যেতে পারতাম সময়ের অজানা কোনো স্রোতে, তাহলেই সম্ভবত মুক্তি মিলতো। কিন্তু, জীবন কি আর পুতুল খেলার মতো? মন চাইলো খেললাম আর মন না চাইলেই খেলা ভেঙে দিয়ে উঠে গেলাম? জীবন এক কঠিন বাস্তবতার নাম; এমন এক শিকলের নাম, যার বাঁধন থেকে মৃত্যু ব্যতীত কারও নিস্তার নেই।

একদিন বাসায় এসে দেখি রেবেকা মনমরা হয়ে সোফায় বসে আছে। তার মুখাবয়বে বিষাদের অনিঃশেষ রেখা অঙ্কিত। দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সংসার জীবনে তাকে সেদিনের চেয়ে বিমর্ষ, সেদিনের চেয়ে বিধ্বস্ত আমি আর কখনোই দেখিনি। মুখে সর্বদা হাসি জিইয়ে রাখার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিলো তার। আমি যতোখানি রাশভারী, সে ঠিক ততোখানিই হাসিখুশি। তার অকারণ হাসির চোটে আমার মাঝে মাঝে রাগ উঠে যেতো। সেই হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল আর প্রফুল্লতায় ভরপুর আত্মার মানুষটিকে এমন বিমর্ষ, বিহ্বল চেহারায় দেখে আমার বুকের ভেতরটা কোনো এক অজানা আশঙ্কায় ধুকপুক করে উঠলো। কোথা হতে যেন বিপদের করুণ বীণ বেজে বেজে একটি সমূহ দুর্যোগের আভাস ধেয়ে আসছে আমার কানে। সেই বিধ্বংসী, বিনাশী সুরের অকৃপণ যাতনায় আমি যেন বিমূঢ় হয়ে গেলাম ক্ষণিকের জন্য।

খুব দুর্বল চিত্তের মানুষ আমি। যেকোনো কিছুতেই অস্থির হয়ে পড়ার বাতিক রয়েছে। তবুও, ভেতরে একটু শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে বললাম, 'রেবেকা, ওমন মলিন মুখে বসে আছো যে? কোনো সমস্যা?'

সমস্যা যে হয়েছে সে ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। তাও প্রশ্ন করার জন্যই প্রশ্ন করা। রেবেকা আমার দিকে তাকাতেই হুড়মুড় করে তার দু-চোখ বেয়ে নেমে এলো শ্রাবণ ধারার জল। সারাটা জীবনের সবটুকু মেঘ সম্ভবত তার চোখে আজকের জন্যই জমা হয়ে ছিলো। সুযোগ পেয়ে বাঁধভাঙা ঢেউয়ের মতন বুকে আছড়ে পড়লো সেই

মেঘভাঙা বৃষ্টির দল। তাকে কোনোরকমে শান্ত করে জিগ্যেশ করলাম, 'কী হয়েছে বলবে তো?'

আমার বুকে মাথা গুঁজে গোঙাতে থাকে রেবেকা। সে এক অদ্ভুত বিষাদের গোঙানি। রংহীন সেই বিষাদের মর্মযাতনা আমার বুকের ভেতরটাকে যেন এফোঁড়ওফোঁড় করে দিয়ে গেলো।

[তিন]

মাদকে আসক্ত এক সন্তানের পিতা আমি—ভারি দুঃস্বপ্নেও নিজেকে এ অবস্থায় ভাবা আমার পক্ষে অসম্ভব। সারা জীবনের নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ মানুষ হওয়া এবং আদর্শ মানুষ তৈরির স্বপ্ন দেখা এই আমার পক্ষে নিজের একমাত্র ছেলেকে মাদকের দুনিয়ায় হারিয়ে যেতে দেখে যেন আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলো। এক গভীর চোরাবালির স্তূপে আমি যেন নিমজ্জিত হতে চলেছি, সাথে অপমৃত্যু ঘটছে আমার সকল স্বপ্ন আর সাধনার। যে সন্তানকে নিজের যোগ্য উত্তরসূরি, যোগ্য উত্তরপুরুষ বানাবার প্রবল ব্রত আমার মনে, মাদকের নেশায় অন্যায়ে জড়িয়ে পড়া সেই সন্তানকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জানিয়ে গেছে পুলিশ কর্তৃপক্ষ। আমার মতো বাবাদের জন্যে এমন লজ্জাকর, এমন মাথা হেঁট করা দিন দেখবার চাইতে মৃত্যু ঢের উত্তম!

জীবনের কাছে আমার পাওনা ছিলো অঢেল আর প্রত্যাশা ছিলো সীমাহীন। সারাজীবন আলো ফেরি করে বাঁচতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সেই আলো যে নিজের ঘরে জ্বালাতে পারলাম না—এই দুঃখবোধ আমি ঘুচাবো কেমন করে? তাহলে কি জীবন আমার সাথে ছলনা করলো? তবে কি ভাগ্যের কাছে আমি পরাস্ত হয়ে গেলাম?

থানা থেকে আসা অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট কপিটা হাতে নিয়ে আমি ধপ করে সোফায় বসে পড়লাম।

[চার]

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে একটা ব্যাপার নিয়ে বেশ শোরগোল শুনতে পেলাম। সম্ভবত আমার ডিপার্টমেন্টের কোনো এক ছাত্রীকে নিয়েই। সাদামাটা ব্যাপার, অন্যদের টেবিলে গড়িয়েই ব্যাপারটার সুরাহা করার সুযোগ থাকলেও তা হলো না। সেটা

গড়িয়েছে আমার টেবিল পর্যন্ত। হলুদ খামে ভরা একটা চিঠি আমার টেবিলের ওপরে রাখা। চিঠি না বলে ওটাকে দরখাস্ত বলাটাই শ্রেয়। একবার ইচ্ছে হলো জিনিসটাকে আবর্জনার বিনে ছুড়ে ফেলে দিই। পরক্ষণে মনে হলো—যে গাধাটা এই বস্তুটা আমার টেবিল পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে তাকে ডেকে আচ্ছামতো ঝেড়ে দিই। শেষ পর্যন্ত কোনোটাই করা হলো না। নিতান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে হলুদ খামে মোড়ানো সেই দরখাস্তটা আমি ধীরহস্তে খুলে পড়তে শুরু করলাম।

পিয়নকে ডেকে বললাম, 'এই দরখাস্তটা যার, তাকে বলো আমার রুমে আসতে।'

পিয়ন 'জি স্যার' বলে এক দৌড়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো। বেশ খানিকক্ষণ পর আগাগোড়া বোরকায় ঢাকা একটি মেয়ে, তার সাথে একজন মধ্যবয়েসী লোক আমার রুমে এলো। উভয়কে বসতে বলে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এই দরখাস্ত তুমিই লিখেছো?'

মেয়েটা আস্তে করে বললো, 'জি স্যার।'

'হিজাব পরে ক্লাস করা যাবে না—এটা তোমাকে কে বলেছে?'

'আমাদের একজন ম্যাডাম।'

'উনি যা বলেছেন তা আমাকে বিস্তারিত খুলে বলো।'

'ম্যাডাম বলেছেন হিজাব পরে ক্লাসে আসা যাবে না। ক্লাস করতে হলে এ রকম বোরকা-হিজাব ছাড়াই করতে হবে। আমার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও ম্যাডাম আমার কোনো কথা শুনতে রাজি হননি। সাফ জানিয়েছেন আমাকে পরের সেমিস্টারে এক্সাম হলেও বসতে দেবেন না, যদি না আমি আমার হিজাব ছাড়তে রাজি হই।'

'তোমার সিদ্ধান্ত কী এখন?'

'স্যার, আমার সিদ্ধান্ত হলো—হিজাব পরে ক্লাস করতে না দিলে আমি আর এখানে পড়াশোনা করবো না।'

'তুমি কি ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছো?'

'জি।'

'ক্যারিয়ারের কথা একবারও ভেবেছো কি? তোমার রেজাল্ট দেখলাম বেশ চমৎকার। একটা ভালো সাবজেক্টে পড়ছো তুমি। তোমার সামনে যে অবাধ সাফল্য অপেক্ষা করছে, তা তুমি বুঝতে পারছো?'

মেয়েটা কিছু না বলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তার নীরবতার সুযোগ নিয়ে পুনরায় বললাম, 'তোমার যে রেজাল্ট এবং যে সাবজেক্ট তা কতো শিক্ষার্থীর সারাজীবনের আরাধ্য স্বপ্ন তুমি বলতে পারো? তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে সাফল্যমণ্ডিত ক্যারিয়ার, আর তুমি সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে যেতে চাইছো?'

মেয়েটা এবার আগের চাইতে আরও স্পষ্ট, আরও গোছানো গলায় বললো, 'আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার। আপনার শিক্ষকসুলভ দরদ আমি বুঝতে পারছি; কিন্তু আমার ধর্মকে যেখানে ছোটো করে দেখা হয়, সেখানকার সাফল্যে সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আমার ধর্মপালনের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়ে যদি কোনোদিন আমার ক্যাম্পাস আমাকে ডাকতে পারে, সেদিন সানন্দে আমি ফিরে আসবো। আমার ধর্ম আমার স্বকীয়তা। স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়ে সফল হওয়াকে আমি প্রকৃত সফলতা ভাবতে নারাজ।'

নিজের অভিমতের ওপর মেয়েটার দৃঢ়তা আমাকে যদিও বা মুগ্ধ করেছে, তথাপি যে বোকামি সে করতে যাচ্ছে তার জন্যে আফসোস করা ছাড়া আর কীই বা করার থাকতে পারে? আমি বিষণ্ণ এবং হতাশ গলায় বললাম, 'এটাই তোমার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত?'

'জি', মেয়েটা একবাক্যে উত্তর দিলো।

এতোক্ষণ পর মেয়েটার বাবার দিকে নজর দেওয়া গেলো। ভদ্রলোকের চেহারা দেখে মোটেই বিচলিত কিংবা চিন্তিত বলে মনে তো হলোই না, বরঞ্চ মেয়ের এমন হঠকারী সিদ্ধান্তে তার যে অবাধ উস্কানি রয়েছে, সেটার প্রচ্ছন্ন ছায়া যেন চোখেমুখে লেপ্টে আছে। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—আমাদের এতোক্ষণের আলাপচারিতায় ভদ্রলোক টুঁ শব্দটিও করেননি। কিছুটা রাগ হলো আমার। মেয়েটা না-হয় অবুঝ। দুনিয়াটাকে সাদা-কালো জ্ঞান করছে। কিন্তু চুল-দাড়িতে পাক ধরা এই বয়স্ক ভদ্রলোকের কেন যে এমন ভীমরতি হলো তা বোঝা মুশকিল। মেয়ের এমন অবিবেচক সিদ্ধান্তে একজন বাবাকে এতোটা নির্ভার দেখতে বেশ দৃষ্টিকটুই লাগছে।

খানিকটা রুক্ষ এবং তীক্ষ্ণ গলায় বললাম, 'আপনিই কি ওর বাবা?'

'জি।'

'আপনার মেয়ের এই সিদ্ধান্তকে আপনি সমর্থন করেন?'

বেশ হাসিখুশি চেহারায় লোকটা বললো, 'অবশ্যই করি। কেবল সমর্থন নয়, আমি দারুণভাবে এপ্রিশিয়েট করি।'

আমি বেশ হকচকিয়ে গেলাম ভদ্রলোকের কথা শুনে! ভালো একটা ডিপার্টমেন্টে পড়ে মেয়েটা। গ্র্যাজুয়েশানটা শেষ করতে পারলেই ভালো ক্যারিয়ারের হাতছানি সামনে। এমন অবস্থায় খুবই সামান্য একটা ইস্যুতে পড়াশোনাই ছেড়ে দিতে চাচ্ছে, আর সেটাকে বসে বসে নাকি এপ্রিশিয়েট করছে তার বাবা! এমন পাগলও হয় দুনিয়ায়?

কপাল কুঁচকে আমি বললাম, 'আপনার কাছে এটাকে এপ্রিশিয়েট করবার মতো কোনো ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে?'

আমার কপালের ভাঁজ-রেখা ভদ্রলোককে বিভ্রান্ত কিংবা চিন্তিত কোনোটাই করতে পারলো না। চেহারায় আগের মতোই হাসি হাসি ভাব জিইয়ে রেখে তিনি বললেন, 'কেন নয়, বলুন? আমার মেয়ে দুনিয়ার জীবনের প্রাপ্তির বদলে আখিরাতের প্রাপ্তিকে বড় করে দেখতে শিখেছে। অর্থনীতিতে 'অপরচুনিটি কস্ট' বলে একটা ব্যাপার আছে। বিশাল কিছু পাবার আশায় ক্ষুদ্র কিছু ত্যাগ করার নামই হলো অপরচুনিটি কস্ট। আমার মেয়ে অনন্ত জীবনের সফলতার জন্য দুনিয়ার ক্ষণিক সফলতাকে জলাঞ্জলি দিতে চাইছে—মুসলিম বাবা হিশেবে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আমার জন্য আর কিছুই হতে পারে না।'

জাদুশক্তির ওপরে আমার কোনো আস্থা কোনোকালেই ছিলো না। কিন্তু সেদিন ভদ্রলোকের কথাগুলো আমাকে এমনভাবে মোহগ্রস্ত করে ফেলে যে, মুহূর্তের জন্য মনে হলো আমাকে কেউ জাদু করেছে। তার সাদামাটা কথাগুলোর ভাঁজে আমি এমন ভার, এমন তৃপ্তি আর আত্মতুষ্টির সন্ধান পেলাম, যা আমি জীবনভর খুঁজে চলেছি। জীবন নিয়ে এভাবেও ভাবা যায়? এমন জীবনদর্শনও মানুষ অন্তরে লালন করতে পারে? স্বার্থপরতার এই দুনিয়ায় এমন মানুষও আছে, যারা জীবনের

গোলকধাঁধায় ভড়কে যায় না, হারিয়ে যায় না? যারা অনুপম আদর্শকে বুকে ধারণ করে তার জন্য জীবনের সবটুকু সুখ, সবটুকু আহ্লাদকে ছেড়ে দিতে পারে? আমি ভাবলাম—আমার ছেলেটাকেও যদি এ রকম দীক্ষা দিতে পারতাম! যদি বলতে পারতাম—এটাই তোমার শেষ গন্তব্য নয়। এরপরে অনন্ত এক গন্তব্যে তোমাকে পাড়ি জমাতে হবে। সেই গন্তব্যের পথকে মসৃণ রাখতে তোমাকে ত্যাগ করতে হবে দুনিয়ার সকল মোহ।'

ইশ! যদি সত্যিই তাকে এভাবে মানুষ করতে পারতাম, আজ আমিও কি বাবা হিশেবে গর্ববোধ করতে পারতাম না? ছেলে মাদকাসক্ত, মাতাল আর নষ্ট হয়ে গেছে বলে কি বুকে এক জগদ্দল পাথরের স্তূপ আমাকে বয়ে বেড়াতে হতো?

দরখাস্তটার ওপর আবার চোখ পড়লো আমার। মেয়েটা একেবারে শেষে নিজের নাম লিখেছে এভাবে—আয়িশা বিনতু আলাদিন। আলাদিন নামটা দেখেই এতো দুঃখ-কষ্টের মাঝেও আমি কেন যেন ফিক করে হেসে ফেললাম। আমাদের কৈশোরের সেই আলাদিনের স্মৃতি আমার অবচেতন মন কীভাবে যেন মস্তিষ্কের স্মৃতিঘর থেকে খুঁজে বের করে এনেছে। আমার কপালের ভাঁজ লোকটাকে বিভ্রান্ত করতে না পারলেও, আমার ফিকে হাসিটা তাকে ঠিকই বিভ্রান্ত করে দিলো। ভদ্রলোক নিজ থেকেই বললেন, 'দুঃখিত স্যার, একটা কথা জানতে চাইছি। দরখাস্তটা দেখে একটু আগে আপনি হেসে ফেললেন দেখলাম। এখানে কি ভুল কিংবা অসৌজন্যমূলক কিছু লেখা আছে?'

আমার হাসিটা যে মৃদু কোনো হাসি ছিলো না; বরং চোখে লাগার মতোই ছিলো—তা বুঝতে পারলাম হাসির ব্যাপারে ভদ্রলোকের চোখমুখ ভরা পেরেশানি দেখে। তাকে অভয় দিয়ে বললাম, 'সেরকম কিছু না আসলে। আপনার নামটার সাথে আমার কৈশোরের সুন্দর কিছু স্মৃতি জড়িয়ে আছে। দরখাস্তে আপনার মেয়ের নামে চোখ পড়ে যেতেই আমি খানিকটা স্মৃতিকাতুরে হয়ে পড়েছিলাম।'

লোকটা আমার কথায় বেশ আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, 'কেমন স্মৃতি, একটু বলা যাবে প্লিজ?'

নিজের একান্ত ব্যক্তিগত স্মৃতির ব্যাপারে অন্য কারও আগ্রহ আমার জন্য রীতিমতো পীড়াদায়ক। তবে, আমার কৈশোরের সেই স্মৃতিটার সাথে এই লোকটার নামের যেহেতু কাকতালীয় একটা মিল আছেই, তাই তার সামনে সেই স্মৃতির কিছু অংশ

রোমন্থন করতে মন চাইলো।

'আসলে, হাইস্কুলে আমাদের ক্লাসে এক ছাত্র ছিলো আলাদিন নামে। পড়াশোনায় খুব বেশি ভালো সে কখনোই ছিলো না। তবে সে খুবই ভদ্র আর নিরীহ গোছের ছিলো। চেহারায় হাবাগোবা একটা ভাব, কথাবার্তায় অপটু আর নিতান্ত শান্ত স্বভাবের কারণে তাকে আমরা 'হাবাগোবা আলাদিন' নামে ডাকতাম। তার কিছু স্মৃতি আজকাল আমাকে ভীষণভাবে ভাবায়। আমাদের সেই আলাদিন কতো অল্প বয়সে, কতো নিবিড়ভাবেই না জীবনকে বুঝতে শিখেছিল। অথচ তাকে আমরা কখনোই পাত্তা দিতাম না। লাস্ট বেঞ্চের ছাত্র জ্ঞান করে সব সময় উত্ত্যক্ত করতাম। জানি না আজ সে কোথায়। জীবনের পাঠোদ্ধারে সে আর কোন মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়েছে তাও বলতে পারি না। তবে এটা জানি—আমরা যারা একসময় তাকে উপহাস করেছিলাম, তারা একটা কুয়ো থেকে একটা পুকুরে এসে পড়েছি কেবল। সমুদ্র দেখার সৌভাগ্য আমাদের আর হলো কই?'

কথাগুলো বলতে গিয়ে আমার কণ্ঠস্বর বারবার আড়ষ্ট হয়ে পড়ছিল। হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল এক গভীর আবেগ। সে আবেগ যতোখানি না আলাদিনের জন্যে, তারচেয়ে বেশি তার সেই জীবনদর্শনের জন্যে, যার দিকে একসময় প্রফুল্লচিত্তে সে আমাদের আহ্বান করতো।

তিনি কথা বললেন এবার, 'সেই স্কুলটার নাম কি সাদনপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়?'

আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল পানির স্রোত যেন নিচে নেমে গেলো। চমকাবারও একটা সীমা থাকে, কিন্তু এ'বেলায় আমি সেই সীমা-পরিসীমা ছাড়িয়ে গেলাম যেন। চোখেমুখে বিপুল বিস্ময় ধরে রেখে আমি বললাম, 'ঠিক তাই। কিন্তু আপনি কীভাবে জানলেন?'

হেসে ফেললেন লোকটা। তার ঠোঁটের কোনায় সেই মুক্তো-ঝরা হাসি যেন অনেক রহস্যের জট খুলে দেয়। আমার বিস্ময়ের পারদকে মহাশূন্যে তুলে দিয়ে তিনি বললেন, 'আমিই সেই হাবাগোবা আলাদিন।'

বজ্রাহত মানুষের মতো স্থির হয়ে গেলো আমার দৃষ্টি। আমাদের সেই আলাদিন আমার সামনে বসে আছে—এ যেন এক অবিশ্বাস্য বাস্তবতা! আমার গলার আওয়াজ কোথায় যেন লুপ্ত হয়ে গেলো। নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিয়ে

বললাম, 'তু-তু-মি সত্যিই আমাদের সেই আলাদিন?'

'তুমি রূপম, তাই না?'

'কীভাবে বুঝলে?'

'শুনেছিলাম আমাদের ওই স্কুলের এক ছাত্রের বেশ নামডাক হয়েছে। দুনিয়াজোড়া খ্যাতি পেয়েছে। আর তা ছাড়া তোমার চেহারাও তেমন পাল্টায়নি। আগের মতোই আছে। এই চেয়ারে তোমাকে দেখে এবং স্কুলের কথা উঠে আসাতে মনে হলো যে, তুমি ছাড়া আর কে হতে পারে?'

'তুমি আমার চেহারাও মনে রেখেছো, আলাদিন?'

হেসে ফেলল সে। তার দেখাদেখি আমিও হাসতে লাগলাম। আমার মনে পড়ে যায় সেই কৈশোরের গল্প! সেই স্কুল, সেই ক্লাসরুম, সেই বন্ধুদের। কতো স্মৃতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সাদনপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠের ধুলোয়, কাঠের বেঞ্চে।

আমি জিগ্যেশ করলাম, 'এটা তোমার মেয়ে?'

'হ্যাঁ।'

হিজাব-আবৃতা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'বাপকি বেটি হয়েছিস। বেঁচে থাক মা।'

[পাঁচ]

আলাদিনের সাথে আমার অনেক আলাপ হয়ে গেছে। আমাদের সেই বিজ্ঞান স্যারের গল্প, অঙ্ক স্যার যে তাকে 'মুদি দোকানদার' বলে ডাকতো সেই গল্প, ডাকাবুকো মুনতাসিরের গল্প-সহ আমার বিদেশ-বিভুঁইয়ের হরেক পদের গল্প। বাদ যায়নি আমার উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলেটার গল্পও। নিয়তির কী নির্মম পরিহাস! নামের সাথে জগৎ-জোড়া খ্যাতির ডিগ্রি থাকার পরেও আজ আমি একপ্রকার ব্যর্থ, আর নিতান্ত সাধারণ জীবনযাপনের আলাদিন আজ আমার সামনে একজন সফল পিতা হিশেবে দণ্ডায়মান!

আমি আলাদিনের হাত ধরে বললাম, 'চলো আমরা আবার আমাদের সেই কৈশোরে ফিরে যাই। সেই সাদনপুর স্কুলে। টিফিন পিরিয়ড শেষে তুমি রোজ দেরি করে ক্লাসে আসবে আর বিজ্ঞান স্যার বিনা বাক্য-ব্যয়ে রোজকার মতো তোমাকে ছেড়ে দেবে। আযান হলে তুমি এসে আমাদের বলবে, 'যুহরের আযান হচ্ছে। আমার সাথে মসজিদে যাবে? এই যে দেখো, মুয়াজ্জিন বলছে, 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ।' মানে হলো—সফলতার পথে এসো। জীবনে সফল হতে চাইলে চলো আমরা সালাতে যাই।'

যদি সত্যিই ফিরে যেতে পারি জীবনের সেই দিনগুলোতে, সত্যি বলছি আলাদিন, সফলতার পথে তোমার সেই উদাত্ত আহ্বানগুলো আর কোনোদিন উপহাসে ফিরিয়ে দেবো না।'